ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয় কারো 'পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৩ বর্ষ | ২১তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ ০১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ ১১ জমা. সানি, ১৪৩২ হিজরি ১৫ হিজরত, ১৩৯০ হি. শা. ১৫ মে, ২০১১ ঈসাব্দ

সরিষাবাড়ী এলাকায় নও মোবাঈন জলসা-২০১১

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত মসীহ্ মাওউদ দিবস

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা

সম্পাদকীয়

আহমদীয়া খিলাফত চির প্রবহমান এক কল্যানধারা

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর ওফাত লাভের পর *'খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াত'*-এর ধারায় ১৯০৮ সালের ২৭ মে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে খিলাফত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই খিলাফতেরই একশত তিন বছর পূর্ণ হতে যাচ্ছে আগামী ২৭ মে তারিখে, আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ্ তাআলার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা প্রকাশার্থে সারা বিশ্বজুড়ে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে খিলাফত প্রতিষ্ঠার এই দিনটি উদযাপন করে থাকে। নবুওয়াতের পর প্রতিষ্ঠিত খিলাফত কুদ্‌রতে সানীয়ার–দ্বিতীয় মহিমার প্রথম বিকাশ ঘটিয়েছেন হযরত হাফেয হেকীম নুরুদ্দিন (রা)। প্রতিষ্ঠিত সেই খিলাফতের ধারাবাহিকতায় আজ এই ৫ম খিলাফত কালেও সত্যের বিরোধীতায় প্রচন্ড বাধা বিঘ্ন ও ঝড় ঝঞ্ঝা পেরিয়ে সাফল্যের এক স্বর্ণযুগ অতিক্রম করে চলছে এই জামা'ত। অভ্যন্তরীন বিরোধীতা, একশ্রেণীর আলেম সমাজের মারমুখীতা, এমনকি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিরোধীতার কবল থেকে আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা নিজ হস্তক্ষেপে এই খিলাফতের আশিসময় ধারাকে শান্তি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতির ক্রমবর্ধমান সোপানে অবিরত উত্তরণ ঘটিয়ে চলছেন। আল্লাহ্ তাআলা আহমদীয়া খিলাফতকে নিজ কোলে তুলে রেখেছেন। আমাদের প্রাণপ্রিয় ইমাম সৈয়্যদনা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন-ইসলামের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে সর্বপ্রকার কুরবানী প্রদান করতে আর ভুপৃষ্ঠের প্রতিটি প্রান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.) এর দ্বারা সূচিত ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্প্রসারণে নিজেরা সর্বাত্মকভাবে নিবেদিত থাকব। সেই সাথে মুহাম্মদী মসীহ্ (আ.) এর মাধ্যমে ইসলামের পুনর্বিজয় যাত্রায় প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের এই ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখতে প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ঐশী সাহায্য ও সমর্থনপুষ্ট খিলাফতের সাথে আমাদের কৃত এ অঙ্গীকার পূরণে আল্লাহ্ তাআলা সর্বদাই আমাদের সাহায্য ও সহায় আছেন। আসুন! আমরা ইস্তেকামাতের সাথে এ অঙ্গীকার পালনে তৎপর থাকি, জামা'ত ও অংগসংগঠন সমূহের প্রতিটি কার্যক্রমের সাথে নিজেদেরকে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করে রাখি।

হে আল্লাহ্ ! তুমি আমাদের সবাইকে এমনই বানিয়ে দাও আর যুগ খলীফার স্নেহ-মমতা ভরা দৃষ্টিতে, পবিত্র সাহচর্যে ও দোয়ার কল্যাণের ছায়ায় নিজেদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ অস্তিত্বকে বরণ করায় অধিক থেকে অধিকতর যোগ্যতা ও সামর্থ্য দান কর। আমাদের দুর্বলতা সমূহ দূর করে দাও, আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর, আমাদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সাধন কর, যা তুমি পছন্দ কর। তোমার প্রেমাষ্পদদের দোহাই দিয়ে যাচনা করছি যে, তুমি আমাদের প্রতি তোমার কৃপাদৃষ্টি দান করে তোমার ভালোবাসা দিয়ে আমাদের হৃদয় পূর্ণ করে দাও। আমরা যেন তোমার কৃপাবারি বর্ষণে অভিষিক্ত হয়ে খিলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া আহমদীয়ার প্রতি পরিপূর্ণরূপে অনুগত থাকি আর খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার সব দায়িত্ব ও কর্তব্য উত্তমরূপে পালনকারী হই, আমীন।

mPxcÎ

১৫ মে ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
জুমুআর খুতবা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) প্রদত্ত **বাংলাদেশের জন্য শান্তির বাণী**	১৩
হযরত উমর (রা.) মূল: মাশহুদ আহমদ এবং ফজল আহমদ	১৪
ধর্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করুন মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ	১৬
শ্রীকৃষ্ণ ও যীশু খৃষ্ট অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান	১৮
নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামি শিক্ষা মওলানা বশিরুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলাহ	২০
খলীফার আনুগত্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত সংকলন : মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।	২৩
ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল লক্ষ্য মাহমুদ আহমদ সুমন	২৬
জ্বীনদের পরিচয়	২৮
'সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট' ১৯ ডিসেম্বর, ২০১০ অনুষ্ঠিত	৩১
সংবাদ	৩৩
এমটিএ বাংলা অনুষ্ঠানসূচী	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

৫২। সে (অর্থাৎ বাদশাহ্) বলল, '(হে মহিলারা!) তোমাদের (আসল) ব্যাপারটি কী ছিল যখন ইউসুফকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে (পাপকাজে) তোমরা ফুসলাতে চেয়েছিলে?' তারা বললো, '(এরূপ মানুষ সৃষ্টি করার জন্য) আল্লাহ্ মহিমান্বিত![১৩৮৮] আমরা তার মাঝে কোন দোষ দেখতে পাইনি'। আযীযের স্ত্রী বললো, 'এখন সত্য প্রকাশিত হয়ে গেছে। আমিই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে (পাপকাজে) ফুসলাতে চেয়েছিলাম। আর নিশ্চয় সে-ই সত্যবাদী।'

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ ۚ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ ۚ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٥٢﴾

৫৩। (ইউসুফ বলেছিল,) 'এ (কথা জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য) হলো, সে (অর্থাৎ আযীয) যেন জানতে পারে আমি তার অনুপস্থিতিতে তার প্রতি কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং (সবাই যেন জানতে পারে) নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বাসঘাতকদের চক্রান্তকে সফল হতে দেন না।

ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿٥٣﴾

৫৪। আর আমি নিজেকে দুর্বলতামুক্ত বলে দাবী করি না। কেননা মানবপ্রবৃত্তি নিশ্চয় মন্দের দিকে প্ররোচিত করে থাকে। তবে আমার প্রভু-প্রতিপালক যার প্রতি দয়া[১৩৮৯] করেন তার কথা ভিন্ন। নিশ্চয় আমার প্রভু-প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।'

وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥٤﴾

১৩৮৮। এই বাক্যে ব্যক্ত হয়েছে যে মেহমান মহিলাদের হাত (আঙ্গুল) কেটেছিল। নতুবা ইউসুফ (আ.) এই ঘটনার প্রতি নির্দেশ করতেন না। হয়ত হতভম্ব হয়ে অথবা আলাপে নিমগ্ন হয়ে অন্যমনস্কভাবে মহিলাদের অনেকেই তাদের হাত কেটে ফেলেছিল। অর্থাৎ তারা অসাবধানতার মধ্যে পতিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতই যদি এরূপ না ঘটে থাকতো তবে হযরত ইউসুফ (আ.) হাত কাটার কথা উল্লেখ করতেন না। 'হাশা লিল্লাহে' অর্থ আল্লাহ্ বাঁচান, বা আল্লাহ্ মহিমান্বিত! (লেইন)।

১৩৮৯। এই খন্ড বাক্য 'ইল্লা মা রাহিমা রাব্বী' (ঐ ব্যক্তি ছাড়া যার প্রতি আমার প্রভু দয়া করেন) তিন প্রকার ব্যাখ্যা সাপেক্ষ ঃ (ক) সেই নফস যার আল্লাহ্ তাআলার উপর দয়া আছে. 'মা' শব্দাংশ এখানে 'নাফস' অর্থে ব্যবহৃত, (খ) সে ছাড়া যার উপর আমার প্রভু দয়া করেন, এখানে 'মা' মানুষ বা লোক অর্থে ব্যবহৃত (গ) হ্যাঁ, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলারই করুণা যাকে পছন্দ করেন তাকে রক্ষা করে থাকেন। এই তিনটি অর্থ মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিন প্রকারের অবস্থার প্রতি নির্দেশ করে যখন মানুষ আধ্যাত্মিকতার পূর্ণতা অর্জন করে যে অবস্থাকে 'নাফসে মুতমা'ইন্নাহ' বা শান্তি প্রাপ্ত আত্মা বলা হয় (৮৯ : ২৮)। দ্বিতীয় অর্থ সেই লোকের জন্য প্রযোজ্য যে এখনো 'নফসে লও ওয়ামাহ' বা পুণ: পুণ: ভর্ৎসনাকারী আত্মার অবস্থায় রয়েছে (৭৫ : ৩), অর্থাৎ যখন মানুষ তাঁর পাপাচারের এবং স্বাভাবিক কুপ্রবৃত্তিগুলোর বিরুদ্ধে জেহাদ বা লড়াই করতে থাকে যার মধ্যে কুপ্রবৃত্তি বা পশুত্ব প্রবল থাকে বা প্রাধান্য বিস্তার করে চলে। এই অবস্থাকে 'নফসে আম্মারাহ্' বা বেশী বেশী মন্দ কার্যে আদেশ মান্যকারী আত্মা বলা হয়।

হাদীস শরীফ

নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা

হযরত হুযায়ফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমাদের মাঝে নবুওয়াত ততক্ষণ পর্যন্ত থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন এরপর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। এরপর নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তাআলা চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন যুলুম, অত্যাচার, উৎপীড়নের রাজত্ব কায়েম হবে। তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা তা উঠিয়ে নিবেন। তখন তা অহংকার ও জবরদস্তি মূলক সাম্রাজ্যে পরিণত হবে এবং তা ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ চাইবেন। তখন নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর তিনি (সা.) নীরব হয়ে গেলেন (মুসনাদ আহমদ, মিশকাত)।

ব্যাখ্যা ঃ পবিত্র কুরআন হতে এ বিষয়টি পরিষ্কার, আল্লাহ্ তাআলা ঈমান আনয়নকারী ও পুণ্যকর্মকারীদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন। হাদীস হতেও এ বিষয়টি প্রমাণিত। অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীয়া যখন কুরআনের শিক্ষার উপর সঠিকভাবে আমল করবে তখন আল্লাহ্‌র এ অঙ্গীকার পূর্ণ হবে।

হযরত ইমাম মাহদী (আ.) বলেন,

“কিছু লোক ওয়াদাল্লাহুল্লাযীনা আমানূ মিনকুম ওয়া আ'মেলুস সা'লেহাতে লাইয়াসতাখলেফান্নাহুম ফিল আরযে কামাস্ তাখলাফাল্লাযীনা মিন কাবলিহিম” এর বিষয়টিকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। তারা ‘মিনকুম’ - (তোমাদের মধ্য হতে–অনুবাদক)-এর অর্থ শুধু সাহাবাদের (রা.) নিয়ে থাকেন, এবং বলেন খিলাফত তাদের মাঝেই ও তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে ও কিয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের নাম গন্ধ থাকবে না। এ কথার অর্থ হলো খিলাফত স্বপ্নের মত শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত ছিল এবং এরপরে ইসলাম ক্রমাগত অধপতনের অশুভ গর্ভে নিপতিত হয়ে গেলো।

এগুলোকে নিয়ে যদি কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে তবে আমি কিভাবে বলতে পারি যে সে ব্যক্তি এ বিষয়টিকে বুঝতে পারে নি যে, এখানে খিলাফতের অঙ্গীকার স্থায়ীভাবে করা হয়েছে। এ খিলাফত যদি স্থায়ী না হয়ে থাকে তবে মূসা (আ.)-এর শরীয়তের খলীফাদের সাথে তুলনা দেবার কী প্রয়োজন ছিল?

যেহেতু মানুষের জন্য কোন স্থায়ীত্ব নেই তাই আল্লাহ্ তাআলা চেয়েছেন যে, মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম সত্তার অধিকারী রসূলকে যিল্লী (প্রতিবিম্ব)-ভাবে কেয়ামত পর্যন্ত জীবিত রাখবেন। তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি খিলাফত সৃষ্টি করেছেন যাতে করে রেসালতের কল্যাণ হতে পৃথিবী যেন কখনও বঞ্চিত না হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি খিলাফতকে শুধু তিরিশ বছর পর্যন্ত মানে সে মূর্খতাবশতঃ খিলাফতের মূল উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে। খোদা তাআলার উদ্দেশ্য কখনও এটা ছিল না যে, রসূল করীম (সা.)-এর ওফাতের পর রেসালতের কল্যাণকে খলীফাদের সত্তায় তিরিশ বছর পর্যন্ত বিদ্যমান রাখবেন আর এরপর পৃথিবী যদি ধ্বংসও হয়ে যায় তবে কোন পরওয়া নেই” (শাহাদাতুল কুরআন পৃঃ ৩৪, পৃঃ ৫৮)।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের খিলাফতের রজ্জুকে ধরে এর আশিস হতে কল্যাণমন্ডিত হবার তৌফিক দান করুন, আমীন!

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

‘তোমার অনুবর্তী এ জামা’তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো’

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

কাফেরেরা দাবীর সাথে বলেছে যে, এখন এই ধর্ম শিগ্‌গীরই ধবংস ও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তাদের এই সাক্ষ্য কুরআন করীমে বিদ্যমান রয়েছে। সেই সন্ধিক্ষণে তাদের শোনানো হয়েছিল– **ইউরিদুনা আই'ইউত্‌ফিউ' নূরাল্লাহি বি আফওয়া হিহিম্ ওয়া ইয়া' বাল্লাহু ইল্লা আই'ইউতিম্মা নূরাহু ওয়ালাও কারিহাল কাফিরুন** [সূরা আত্‌ তাওবা ঃ ৩২] অর্থাৎ এ লোকেরা গর্ব ও অহঙ্কার ভরে নিজ মুখে বাগাড়ম্বরের সাথে প্রলাপ বকে যে–‘এ ধর্ম কখনও সফল হবে না, এ ধর্ম আমাদের হাতে ধ্বংস হয়ে যাবে’। কিন্তু খোদা কক্ষনও এ ধর্ম বিনষ্ট হতে দেবেন না যতক্ষণ না একে পূর্ণতা দান করছেন, ততক্ষণ তিনি ক্ষান্ত হবেন না ।

অপর এক আয়াতে তিনি বলেছেন, **ওয়া আ'দাল্লাহুল্লাযিনা আমানু** ....[সূরা তুন্‌ নূর ঃ ৫৬] অর্থাৎ খোদা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, এই ধর্মে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের পর খলীফাদের সৃষ্টি করবেন এবং কিয়ামতকাল পর্যন্ত তা প্রতিষ্ঠিত রাখবেন অর্থাৎ যেভাবে মূসা (আ.) এর সিলসিলায় দীর্ঘকাল ধরে খলীফা ও বাদশাহ্ প্রেরণ করেছেন তেমনিভাবে এক্ষেত্রেও করবেন আর তা নির্বাপিত হতে দিবেন না [জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা ২৯০]

অতএব হে বন্ধুগণ! আদিকাল থেকে আল্লাহ্ তাআলার বিধান যখন এটাই যে, তিনি দু'টি শক্তি প্রদর্শন করেন যেন বিরুদ্ধবাদীদের দু'টি মিথ্যা উল্লাসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে দেখান। সুতরাং এখন সম্ভবপর নয় যে, খোদা তাআলা তাঁর চিরন্তন নিয়ম পরিহার করবেন। এজন্য তোমাদেরকে আমি যে কথা বলেছি, তাতে তোমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। তোমাদের হৃদয় যেন উদ্বেগাকুল না হয়। তোমাদের জন্য দ্বিতীয় কুদরতও দেখা আবশ্যক, কেননা এর আগমণ তোমাদের জন্য শ্রেয়। কারণ এটা স্থায়ী, যার চলমান ধারা কিয়ামত পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হবে না। যতক্ষণ আমি না যাচ্ছি সেই দ্বিতীয় কুদরত আসতে পারে না। আর আমি যখন চলে যাবো, তোমাদের জন্য খোদা তখন সেই দ্বিতীয় কুদরত প্রেরণ করবেন যা তোমাদের সাথে চিরকাল থাকবে, যেমনটা ‘বারাহীনে আহমদীয়া’-য় খোদার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি আমার নিজের সম্পর্কে নয় বরং তোমাদের সম্পর্কে। যেমন– খোদা তাআলা বলেছেন ঃ

ম্যাঁয় ইস্ জামা’তকো জো তেরিঁ পেয়রু মেঁ কিয়ামত তক দুসরোঁ প্যর গালবাহ্ দুঙ্গা

[অর্থাৎ ‘তোমার অনুবর্তী এ জামা’তকে আমি অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেবো’ – অনুবাদক]

সুতরাং তোমাদের সাথে অবশ্যই আমার বিচ্ছেদের দিন আসবে, যেন এর পর সেই দিন আসে যা ‘চিরস্থায়ী প্রতিশ্রুত দিবস’।

[আল ওসীয়্যত, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০৫-৩০৬]

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে ১লা এপ্রিল, ২০১১-এ প্রদত্ত জুমুআর খুতবা

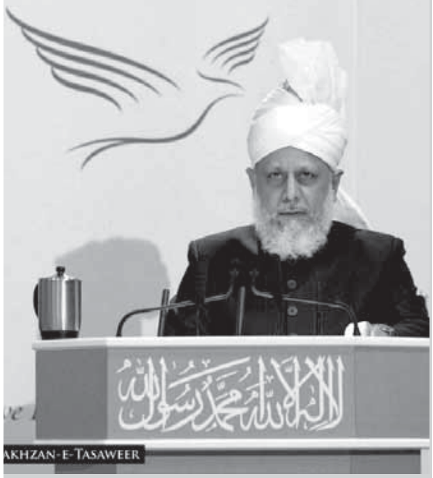

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

> "শাসক যদি অত্যাচারী হয় তাহলে তার বদনাম করে বেড়িও না বরং নিজের অবস্থার সংশোধন কর। খোদা তাকে পাল্টে দিবেন অথবা তাকেই পুণ্যবান করে দিবেন। যে কষ্ট আসে তা নিজের অভ্যন্তরীণ মন্দ কর্মের কারণে আসে। নতুবা মু'মিনের সাথে খোদার সাহায্য থাকে।
>
> মু'মিনের জন্য আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং উপকরণের ব্যবস্থা করেন। আমার উপদেশ এটিই তোমরা সকল দিক থেকে পুণ্যের আদর্শ হও। খোদার অধিকারও খর্ব করবে না আর বান্দার অধিকারও খর্ব করবে না।"

তাশাহ্হুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন,

কয়েক জুমুআ পূর্বে ফেব্রুয়ারীর শেষ জুমুআয় আমি মুসলিম বিশ্বের জন্য দোয়ার তাহরিক করে, আহমদীদের স্বীয় দায়িত্ব বুঝার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। আমাদের কাছে শক্তি নেই, মাধ্যম নেই যে, আমরা মুসলিম দেশের বাদশাহদের নিকট সরাসরি পরিষ্কার ভাবে আওয়াজ পৌঁছাতে পারি। তাদের বুঝাব যে, আপনারা নিজেদের রাজা হওয়া বা সরকার প্রধান হওয়ার যথার্ত দায়িত্ব পালন করুন। হতে পারে কয়েক জায়গায় কোন মাধ্যমে আওয়াজ পৌঁছে যাবে কিন্তু পরিষ্কার সংবাদ পৌঁছবে কি না এটি জানি না। যাই হোক আমি এটি এ জন্য বলেছিলাম, আহমদী যারা দোয়াতে বিশ্বাস করে তাদের দোয়াতে বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। আল্লাহ্ তাআলা এ শাসকদের জ্ঞান দান করুন যেন এই মুসলিম দেশগুলো প্রত্যেক ধরনের পরাজয় ও কঠিন অবস্থা থেকে রক্ষা পায়।

তদ্রূপ জনগনের জন্যও সংবাদ ছিল, তারাও যেন নিজের দায়িত্ব সমূহ উপলব্ধি করে আর নিজের দেশ গুলোকে সন্ত্রাসী বা অন্যদের থাবায় দিয়ে না দেয়। যাই হোক এ দেশগুলোতে অবস্থানকারী আহমদীদের আমি পয়গাম দিয়েছিলাম, পুণরায় পয়গাম দিচ্ছি, দোয়ার দিকে দৃষ্টি দেন আর দুই দিকেই যত জ্ঞান তাদের দিতে পারেন দেন।

সন্ত্রাসী কোন বিষয়ের সমাধান নয় আর সবচেয়ে বড় অস্ত্র হচ্ছে দোয়া। আহমদীদের অধিকাংশ এ পয়গামকে বুঝে নিয়েছিল আর আল্লাহ্ তাআলার ফযলে আহমদীরা তো সাধারণত ভাংচুরে অংশ নেয় না। এ জন্য তারা ফাসাদে অংশ নেয়নি এবং যুদ্ধ বিগ্রহেও অংশ নেয়নি। তবে কতক এমনও আছে যাদের মনে প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমরা বল প্রয়োগকারী আর নিযার্তনকারী সরকারের ভুল পলিসি সমূহে কতটুকু ধৈর্য্য ধারণ করব? আমাদের কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত? অথবা কতক আফ্রিকান দেশ সমূহের ক্ষমতা প্রত্যাপনে বাধা দানকারীদের বিরুদ্ধে কিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আইভরিকোষ্টে যেমনটি হচ্ছে, ক্ষমতা প্রত্যাপন হচ্ছে না। অন্য জনগন যে সন্ত্রাসী প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে তাতে আহমদীদের তাদের সাথে মিশে কি পরিমাণ সাপোর্ট দেয়া উচিত বা সরকার বিরোধী মিছিলে অংশ নেয়া উচিত হবে কি? কেন না কতক শিক্ষিতও আমার পয়গামের মর্ম বুঝেনি আর প্রশ্ন করতে থাকেন। কতক সময় তারা হ্যা নাতে উত্তর চান যে, আমাদের নিকট এটি পরিষ্কার করুন, আমরা কাঠিন্যের সাথে আমাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে অংশ নিতে পারি কি না? আর কি পরিমাণ নিযার্তনকে আমরা সহ্য করব। এ বিষয়ে যারা আমাদের আরব দেশ সমূহ বা আফ্রিকার আরবী ভাষি দেশসমূহ দেখেন, আরব ডেক্স্, তাদের হানী তাহের

সাহেব এর সাথে মিটিং করেছিলাম তাদের অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে বিশাদ বর্ণনা দিয়ে বুঝিয়ে ছিলাম, এ অবস্থায় একজন আহমদীর কি প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত? উভয় দিকের ভাল ও মন্দ দিকগুলো কি হবে? এ দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। অত:পর আমি এটিই বলেছিলাম, এ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করে সম্পর্কিত দেশ বা আমাদের যে সকল লোকদের ঐ দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক আছে তাদের নিকট পৌছে দিন যেন আহমদীগণ প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারেন। কিন্তু কতক পত্র এবং প্রশ্ন থেকে আমার মনে হয়, কতক জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টি ভঙ্গি যার ভিত্তি কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি অনুযায়ী, সেটি পরিষ্কার বুঝেন নি। সেটিকে পরিষ্কার করা প্রয়োজন। এ কারণে আমি কিছু বিষয় একত্রিত করেছি যা আপনাদের সামনে রাখতে চাচ্ছি, যেন প্রত্যেক ধরনের সন্দেহ দূরিভূত হয়ে যায়।

সবচেয়ে মৌলিক বিষয় হচ্ছে কুরআন করীম। এতেও আমাদের দেখা উচিত, কুরআন করীম শাসকদের সাথে সহযোগিতা এবং আনুগত্য সর্ম্পকে কি নির্দেশ দেয়। অত:পর এটি যে, সাধারণ বিশৃঙ্খলার একজন মুসলমানের কি প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত। নিজের হক আদায়ের জন্য সংগ্রামে কি পরিমাণ তার অংশ নেয়া উচিত। অত:পর হাদীসসমূহ কি বলে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কি বলেছেন।

যাই হউক আল্লাহ্ তাআলা কুরআন করীমে বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

(আন-নাহল:৯১)

আয়াতের এই যে অংশটি রয়েছে, এটি আমরা প্রতি জুমুআ আরবী খুতবাতে পড়ে থাকি, আর এর অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক ধরণের অশ্লীলতা , অপছন্দনিয় বিষয় ও বিদ্রোহীতা থেকে আল্লাহ্ বারণ করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) 'বাগী' শব্দের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তিনি (আ.) বলেন, 'বাগী' সেই বৃষ্টিকে বলা হয় যা সীমাতিরিক্ত বর্ষিত হয় আর জমিকে নষ্ট করে দেয়। তিনি বলেন বাধ্যতা মূলক হক আদায়ে দুর্বলতা প্রদর্শন কে অথবা বাধ্যতামূলক হক আধায়ের আধিক্যও বাগী বলে। (ইসলামী নীতিদর্শন, রূহানী খাযায়েন ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৪, কম্পিউটারাইজ এডিশন)

তাহলে এটি হচ্ছে কুরআন করীমের সুন্দর শিক্ষা যা প্রত্যেক দিক থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য নির্দেশ। এ নির্দের্শে এ ধারণা আসতে পারে না যে, এটি এক শ্রেণীর জন্য নির্দেশ আর অন্য শ্রেণীর জন্য নয়। এ আয়াতের পূর্ণাঙ্গীন তফসির তো এ সময় বর্ণনা করছি না, কেবল 'বাগাওয়াত' শব্দের ব্যাখ্যা করছি। যেমন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, বাধ্যতামূলক হক আদায়ে দুর্বলতা প্রদর্শন কারী বা বাধ্যতামূলক হক আদায়ে আধিক্যকারী উভয়কে আল্লাহ্ তাআলা বারণ করেন। অর্থাৎ যখন শাসক এবং প্রজাকে নির্দেশ দেয়া হয় তখন উভয়কে নিজেদের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে। না শাসক নিজের দায়িত্ব আর ক্ষমতায় কম-বেশি করবে, না জনগণ নিজের কর্তব্যে কম-বেশি করবে। যে এমনটি করবে সে আল্লাহ্ তাআলার সীমালংঘন কারী হবে। অথ:পর খোদা তাআলা নিয়মে সীমা লংঘনকারী খোদা তাআলার গ্রেফতারেও আসতে পারে। আল্লাহ্ তাআলা অত্যাধিক অপছন্দ করেন। সুতরাং বর্তমানে যেহেতু জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে কঠিন ভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের যোশ রাখে তাই আজ কেবল জনগনের সীমারেখা পর্যন্ত আলোচনা করব। এ সম্পর্কে অনেক হাদীস রয়েছে যাতে শাসকদের ভুল আচরণ সত্ত্বেও সাধারণ মানুষকে, মু'মিনগণকে ধৈর্য ধারণের নির্দের্শ দেয়া হয়েছে।

বুখারী কিতাবুল ফিতন এর একটি অধ্যায়ে আঁ-হযরত (সা.)-এর আনসারদের কে এমন বলা যে, তোমরা আমার পর এমন এমন কাজ দেখবে যা তোমাদের খারাপ লাগবে। আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আমের বলেন, আঁ-হযরত (সা.) আনসারদের এটিও বলেছেন, তোমরা ঐ কাজগুলোতে আমার সাথে হাউযে কাউসারে সাক্ষাত পর্যন্ত ধর্য্য ধারণ করতে থাকবে। যায়েদ বিন ওহাব বলেন, আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসুদ থেকে শুনেছি তিনি বলতেন, আঁ-হযরত (সা.) আমাদেরকে বলেছেন, আমার পর তোমরা দেখবে তোমাদের হক ছিনিয়ে অন্যদের প্রাধান্য দেয়ে হচ্ছে সে সাথে এমন বিষয়ও দেখবে যাকে তোমরা খারাপ মনে করবে। এটি শুনে সাহাবা (রা.) নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাহলে এমন পরিস্থিতিতে আপনি কি নির্দেশ দেন। তিনি (সা.) বলেন, সেই সময়ের শাসকদের হক আদায় করবে আর তোমরা নিজের হক আল্লাহ্র নিকট চাইব। [বুখারী কিতাবুল ফিতান বাব ক্বওলুন্নবী (সা.)]।

অত:পর অন্য এক হাদীসে এসেছে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) আ-হযরত (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের আমীরের কোন বিষয় অপছন্দ করে তাহলে তার ধৈর্য ধারণ করা উচিত, এ কারণে যে, কোন ব্যক্তি নিজের আমীরের আনুগত্য থেকে বিঘত পরিমাণ সরে গেলে তার মৃত্যু অজ্ঞতার মৃত্যুর ন্যায় হবে। [বুখারী কিতাবুল ফিতান বাব ক্বওলুন্নবী (সা.), (সাতারুনা বা'দী আমুরান্ তানকারুনাহা হাদীস : ৭০৫২]

অত:পর ওসাহিদ বিন হুযায়ের থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি আঁ-হযরত (সা.)-এর নিকট আসলেন। তিনি বলতে লাগলেন হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি অমুক ব্যক্তিকে হাকেম নিযুক্ত করেছেন আর আমাকে রাজত্ব দেননি তিনি (সা.) বলেন, তুমি আমার পর এমন দেখবে যে, তোমার উপর অন্যদের প্রধান্য দেয়া হচ্ছে সুতরাং তুমি কিয়ামত দিবসে আমার সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করতে থাক। [বুখারী কিতাবুল ফিতান, বাব ক্বওলুন্নবী (সা.), সাতারুনা বা'দী আমুরান্ তানকারুনাহা হাদীস : ৭০৫৭]।

সালমান বিন ইয়াযিদ আলজা'ফা রাসূল পাক (সা.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের উপর যদি এমন শাসক নিযুক্ত হয় যারা আমাদের নিকট নিজের অধিকার চাইবে কিন্তু আমাদের অধিকার দিবে না তাহলে এমন পরিস্থিতিতে আপনি আমাদের কি নির্দেশ দেন? রাসূলে পাক (সা.) এটির (উত্তর দেয়া) থেকে বিরত থাকেন। তিনি (রা.) পুণরায় নিজের প্রশ্ন পুণরাবৃত্তি করেন, তিনি (সা.) পুণরায় (উত্তর দেয়া থেকে) বিরত থাকেন। তিনি (রা.) দ্বিতীয় বা তৃতীয়বার পুণরায় নিজের প্রশ্ন পুনরাবৃত্তি করেন যাতে আস আ'ছ বিন কায়স তাকে পিছনে টেনে নেন (অর্থাৎ চুপ করানোর চেষ্টা করেন, হুযূর (সা.)-এর এ প্রশ্ন ভাল লাগেনি) তখন রাসূল পাক (সা.) বলেন, এমন পরিস্থিতিতে নিজেদের শাসকদের কথা শুনবে

আর তাদের আনুগত্য করবে। যে দায়িত্ব তাদের দেয়া হয়েছে সেটির হিসাব তাদের থেকে নেয়া হবে আর যে দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে সেটির হিসাব তোমাদের থেকে নেয়া হবে। (মুসলিম, কিতাবুল এমরাতে হাদীস নম্বর : ৪৭৮২)

জুনাদা বিন উমাইয়া বলেন, ওবাদাহ্ বিন সামেত অসুস্থ ছিলেন, তিনি (রা.) তার নিকট গেলেন আর বললেন, আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন, আমাদের এমন হাদীস শুনান যা আপনি আঁ-হযরত (সা.) থেকে শুনেছেন। এ কারণে আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণে ভূষিত করুন। তিনি (রা.) বলেন, আঁ-হযরত (সা.) আমাদের ডেকে পাঠালেন, আমরা তাঁর নিকট বয়আত করি। তিনি আমাদের সর্ব অবস্থায় কথা শুনা ও মান্য করার বয়আত নেন। হউক তা আনন্দ বা নিরানন্দের, কাঠিন্য বা স্বাচ্ছন্দের আর অধিকার হরনেরও। তিনি (সা.) এটিও অঙ্গীকার নেন যে, যে ব্যক্তি নেতা হয়ে যাবে আমরা তার সাথে জগড়া করব না। কেবল এটি ব্যতিরেকে তোমরা তাকে প্রকাশ্যে কুফর করতে দেখ যার সম্পর্কে তোমাদের নিকট আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে দলিল আছে। (সহীহ্ মুসলিম, কিতাবুল এমরাত, বাব হাদীস নম্বর : ৪৭৭১)

এ হাদীসগুলোতে আমীর এবং সরকারের না ইনসাফি এবং শরিয়ত বিরোধী কাজের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে কিন্তু তা সত্বেও তিনি (সা.) বলেছেন, তাদের বিরদ্ধে তোমাদের বিদ্রোহ করার অধিকার নেই। সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, শ্লোগান, ভাঙ্গচুর, বিদ্রোহী ভাব অবলম্বনকারীদের কর্মপদ্ধতি শরিয়ত বিরোধী।

এই শেষ হাদীসটির আরো ব্যাখ্যা করে দিচ্ছি, হাদীসের শেষ আংশের আরবী অর্থ আঁ হযরত (সা.) আমাদের থেকে এ অঙ্গীকারও নেন যে, যে ব্যক্তি শাসক হয়ে যাবে আমরা তার সাথে ঝগড়া করব না কেবল এটি ব্যতিরেকে যে, ‘তোমরা তাকে প্রকাশ্যে কুফর করতে দেখ’ যার সম্পর্কে তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে দলিল আছে।

হাদীসের এ শেষ শব্দগুলোর কতক সালাফী, ওহাবী, অন্য কট্টর ধর্মীয় জামা’ত যারা রয়েছে তারা এ (অর্থ)নিয়ে থাকে যে, সরকারের সাথে লড়াই জায়েয নয় যতক্ষণ ‘কুফরে বাওয়া’ প্রকাশ্যে প্রকাশ না পায়। যদি শাষক থেকে প্রকাশ্য কুফর প্রকাশ পায় তা হলে তার সংশোধনের জন্য শাসন ক্ষমাতা ছিনিয়ে নেয়া আবশ্যক। এই যে কট্টর পন্থি জামাতগুলো তারা এ দলিলের ভিত্তিতে চিন্তা করে রেখেছে যে, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যেতে পারে বরং কতক নিজেদের ফতোয়াকে নিজেদের মাঝে এত দৃঢ় করার চেষ্টা করে যে, অনেক সময় ফতোয়া দান কারীগণ এটি মনে করে যাদের আমরা কাফের আখ্যা দিব তাদের যারা কাফের মনে করবেন না তারাও কাফের। এই যে কাফের আখ্যা দেয়ার প্রবণতা এটি একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতা চলতে থাকে।

যাই হোক হাদীসের মূল শব্দ হ’ল তোমাদের আনুগত্য করতে হবে কেবল এটি ব্যতিরেকে যে, যদি না এমন কথা বলা হয় যা কুফরের কথা বা তোমাদের কুফরে বাধ্য করা হয়। এ ছাড়া প্রত্যেক বিষয়ে আনুগত্য করা উচিত। কুফরের নির্দেশ দিলেও এমন ক্ষেত্রে বিদ্রোহীতা নয় বরং ঐ কথাটি মানবে না। যাই হোক এ গুলো হচ্ছে তাদের দৃষ্টি ভঙ্গী, আহমদীদের নয়।

হ্যাঁ, যেভাবে আমি বলেছি, কতক পরিস্থিতে কেবল কুফরে বাধ্য করা হলে এতায়েত করা যাবে না যার একটি দৃষ্টান্ত আমরা জামাতে আহমদীয়াতে দেখতে পাই।

পাকিস্তানে বা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আহমদীদেরকে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের মুসলমান হওয়ার দাবী করবে না। অতএব আমরা এ কথা মানতে রাজী নই, আমরা মুসলমান বলি। আবার বলা হয় তোমরা কলেমা পড়বে না, আমরা কলেমা পড়ি। বা (তারা বলে) পরস্পরকে সালাম দিবে না বা কুরআনে করীম তেলাওয়াত করবে না, এ গুলো আমাদের ধর্মীয় আর দ্বীনের বিষয় এ সর্ম্পকে হাদীস থেকে স্পষ্ট যে এখানে এতায়েত বা আনুগত্যের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু এখানেও আমরা বিদ্রোহ করি না। আমরা কখনোও কোন আইনকে কেবল এ বিষয়াদিতে মানতে পারি না, কেন না এগুলো শরিয়তের বিষয় । আল্লাহ্ ও রাসূলের নির্দেশের বিষয়। দেশের অন্যান্য আইনের যতটুকু সম্পর্ক আছে এ আইন সত্ত্বেও প্রত্যেক আহমদী অন্য সকল আইনকে মেনে চলে।

আমাদের দৃষ্টি ভঙ্গির স্বপক্ষে পুরনো ইমামদের একজনের একটি উদ্ধৃতি আমি তুলে ধরছি। এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আল নববী (রহ.) বলেন, ‘কুফরে বাওয়া’-এর অর্থ হল প্রকাশ্যে কুফর-এ হাদীসে কুফর শব্দের অর্থ হল পাপ, তিনি আরও বলেন, এ হাদীসের অর্থ হ’ল তোমরা সরকারের বাগডোর যাদের হাতে আছে তাদের ভিতর থেকে ঝগড়া করবে না বা তাদের উপর আপত্তি করবে না। কেবল এটি ব্যাতিরেকে যে, তোমরা তাদের পক্ষ থেকে এমন কোন বিষয় দেখ যা সত্যায়িত ও প্রমাণিত। যার মন্দ হওয়া তোমরা ইসলামী অকিদার আলোকে জান অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসের আলোকে এমটি যদি দেখ তা হলে তাদের এমন কাজকে ঘৃণা কর। আর যেখানে থাক সেখানে ন্যায় কথা বল, কিন্তু শাসক যালেম ও অত্যাচারি হলেও এমন শাসকদের সাথে বিদ্রোহ করা, তাদের সাথে ঝগড়া করা মুসলমানদের ইজমার দৃষ্টি কোন থেকে হারাম। তিনি লিখেন, হাদীসের যে অর্থ আমি বর্ণনা করেছি সেটিকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অন্য হাদীস গুলোও এর সমর্থন করে। আহলে সুন্নত জামাতের এ বিষয়ে ইজমা রয়েছে যে, ফিসকের ভিত্তিতে কোন শাসকের অপসারণ সিদ্ধ নয়, আলেমগণ বলেন যে, পাপি অত্যাচারি শাসকদের অপসারণ না করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার কারণ হ’ল এ ক্ষেত্রে নিজেদের আরও বেশি ফেতনা, নৈরাজ্য, খুনা-খুনি, রক্তা-রক্তি সৃষ্টি হবে। তাই যালেম এবং স্বৈরাচারিকে ক্ষমতায় রাখা তাকে অপসারণ করার তুলনায় কম ফিতনা এবং অশান্তির কারণ হবে। (আলামন হাক্ত বেশারহে সহীহ মুসলিম কিতাবুল আমারাতে, পৃষ্ঠা-১৪৩০, দার ইবনে হাযাম, ২০০২)

আর আজ আমরা দেখছি এ কথা সত্য প্রমানিত হচ্ছে। উভয় পক্ষ যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত মানুষ মারা যাচ্ছে, মুসলমান মুসলমানকে হত্যা করছে।

অত:পর বুখারীর একটি হাদীসে রাসূল পাক (সা.) বলেন, আল্লাহর নিয়ম নীতিতে দুর্বলতা প্রর্দশন কারী এবং আল্লাহর নিয়ম নীতি প্রতিষ্ঠাকারীর উদাহরণ সেই জাতির ন্যায় যারা নৌকার বিষয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করার ফলে কতক নৌকার উপরের অংশে অবস্থান নেয় আর কতক নৌকার নীচের অংশে। যখন নৌকার নীচের অংশের মানুষ পানি নিয়ে নৌকার উপরের অংশের লোকদের পাশ দিয়ে আসত তখন তারা কষ্ঠ অনুভব করত। যার

কারণে নীচে অবস্থান কারীদের মধ্য থেকে একজন কুড়াল নিয়ে নীচে ছিদ্র করতে লাগল, উপরে অবস্থানকারী তার নিকট আসল আর তাকে জিজ্ঞাসা করল তোমার কি হয়েছে? সে উত্তর দিল, আমার উপরে গিয়ে পানি আনা তোমাদের কষ্ট দেয় অথচ পানি ছাড়া আমার চলা অসম্ভব। সুতরাং যদি উপরে অবস্থান কারী তার হাত ধরে তাহলে তাকেও নিমজ্জিত হওয়া থেকে রাক্ষা করবে আর নিজেদেরকেও ডোবা থেকে রক্ষা করবে। যদি তারা তাকে ছেড়ে দেয়, আর নৌকার নীচের অংশে ছিদ্র করতে দেয় তাহলে তারা তাকেও ধ্বংস করে দিবে আর নিজেদেরও ধ্বংস করে দিবে। (সহী বুখারী, কিতাবুশ শাহাদতে, বাবুল কুররাতুফিল্ মুশাকেলাতে হাদীস নম্বর ২৬৮৬)

এ হাদীস থেকে কতক মানুষ এ প্রমাণ দেয় যে, জনসাধারণ মন্দ সম্পাদনকারীদের মন্দ বা ভুল কাজের সংকল্প থেকে বল প্রয়োগে বাধা দেয়া ঠিক নয়। কেননা এতে নিজেদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হবে। অথচ এ থেকে যদি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ নেয়া হয় তাহলে সেটি আঁ হুযূর (সা.)-এর নির্দেশের পরিপন্থি হবে। পূণরায় হাদীসটি পরিষ্কার করে দিচ্ছি, নৌকার লোকেরা যদি তার হাত ধরে তাহলে তারা তাকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে আর নিজেদেরও নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে যদি ছেড়ে দেয় তবে নীচে ছিদ্র হলে সে নিজেও ধ্বংস হবে আর তাদেরও ধ্বংস করবে। এ থেকে এই অর্থ নেয়া হয়ে থাকে যে, যদি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, ক্ষতি হয় তা হলে সেটি নিশ্চিহ্ন করার জন্য বল প্রযোগে বিরত রাখা বৈধ, কিন্তু এটি অন্যান্য হাদীস থেকে বিরোধী। এ বিষয়টি সরকার সম্পর্কে নয়। পুণরায় এ মতের সমর্থনে আঁ হযরত (সা.)-এর হাদীস উপস্থাপন করা হয় আর সেটির উদ্ধৃতির আলোকে এটি প্রকাশ করা হয় যে, আঁ হযরত (সা.) নিজে কাঠিন্যের নির্দেশ দিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.) এমন কোন কথা বলতেই পারেন না যা কুরআনের শিক্ষার পরিপন্থী। নিশ্চিত লোকেরা এটি বুঝতে ভুল করেছে।

আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি রাসূল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্য থেকে যে কেউ অপছন্দনীয় কোন কাজ দেখবে সে যেন সেটি নিজের হাত দিয়ে পরিবর্তন করে দেয়, আর যদি এ শক্তি না থাকে তাহলে নিজের মুখ দিয়ে, আর যদি এ শক্তিও না থাকে তাহলে নিজের হৃদয়ে (মন্দ জ্ঞান করে), আর সেটি সর্বাপেক্ষা দুর্বল ঈমান। (সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, হাদীস নম্বর : ১৭৭) এ হাদীসের ব্যাখ্যা ইমাম আলী কারী লিখেন যার অনুবাদ হচ্ছে, 'আমাদের কতক আলেম বলেন, অপছন্দনীয় কাজকে হাতের দ্বারা পরিবর্তনের নির্দেশ হচ্ছে শাসকদের জন্য, মুখের দ্বারা পরিবর্তন করার নির্দেশ হচ্ছে আলেমদের জন্য, আর হৃদয়ে অপছন্দনীয় কথাকে অপছন্দ করার নির্দেশ হচ্ছে সাধারণ মু'মিনদের জন্য। (মিরকাতুশ শারাহ্, মিশকাত নবম খন্ড, কিতাবুল আদাব হাদীস : ৫১৩৭ পৃষ্ঠা-৩২৪ দ্বারুল কুতুব এলমিয়া দ্বারুত : ২০০১)

সুতরাং এ হলো এ হাদীসের উত্তম ব্যাখ্যা। তিনটি নির্দেশ তো দেয়া হয়েছে কিন্তু তিনটি ভিন্ন শ্রেণীর জন্য আর যারা কর্তৃত্বে আছেন তাদের জন্য। সেখানেও নৌকার ক্ষেত্রে বাধা দেয়ার নির্দেশটি তাকে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করা নৌকার যারা নেতৃত্ব স্থানীয় ছিল তাদের জন্য নির্দেশ। প্রত্যেকে যদি এ ভাবে প্রত্যেককে বাধা দেয় তাহলে একটি নৈরাজ্য সৃষ্টি হবে। বিশৃংখলা এবং অশান্তির বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা সূরা বাকারার ২০৬ নং আয়াতে বলেন, 'ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুল্ ফাসাদ' আল্লাহ্ তাআলা বিশৃংখলাকে পছন্দ করেন না। এ অর্থ যদি করা হয় যে, জনগন সরকারের কোন বিষয় অপছন্দ করলে তাদের সরকারে বিরুদ্ধে দন্ডায়মান হওয়া উচিত আর ভাংচুর বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, সহিংস আচরণ এবং বিদ্রোহ আরাম্ভ করে দেয়া উচিত তাহলে এ ধারণাও শরিয়তের হেদায়াতের পরিপন্থি। এ সম্পর্কে কুরআনের যে নিদের্শ বা সিদ্ধান্ত তা আমি পূবেই বর্ণনা করে এসেছি। যে, 'ইয়ান্ হা আনিল ফাহশায়ে ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগীয়ে (সূরা নহল : ৯১)

সমসাময়িক যুগের শাসকদের আনুগত্যের ব্যাপারে নবীদের কি আদর্শ ছিল? এক হাদীসে আছে যে পৃথিবীতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী আগমন করেছেন। কুরআন করীম প্রায় দুই ডজন বা বিশ পচিশ জন নবীগণের ঘটনা বর্ণনা করেছে। (কানজুল আম্মাল, কিতাবুল্ ফযায়েল্, বাবুস্ সানী ফী ফাযায়েলু সয়ায়েরুল্ আম্বিয়া, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৯, হাদীস ৩২২৭৪) কিন্তু কোন নবী সম্পর্কে কুরআন এ কথা বলেনি যে, জাগতিক বিষয়ে নিজ অঞ্চলের শাসকের বিরুদ্ধে আনুগত্য করেননি বা বিদ্রোহ করেছেন। অথবা তার বিরুদ্ধে নিজ মান্যকারীদের নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন বা ভাংচুর করেছেন। ধর্মীয় বিষয়াদিতে সকল নবী নিজ নিজ অঞ্চলে শাসকদের ভ্রান্ত বিশ্বাস সমূহের সরাসরি নাকচ করেছেন আর সঠিক বিশ্বাস সমূহ পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রচার করেছেন। সাধারণত যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয় সেই হযরত ইউসূফ (আ.)-এর দৃষ্টান্তকে নিচ্ছি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এবং যহরত খলীফাতুল মসীহ সানীও বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ্ তাআলা এর (সূরা ইউসূফের) শুরুতেই বলেন, আমরা তোমার প্রতি এ যে কুরআন ওহী করেছি এর মাধ্যমে আমরা তোমার নিকট প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্যের সবোর্ত্তম অংশ বর্ণনা করছি যার সম্পর্কে পূর্বে তুমি গাফেলদের অন্তর্ভূক্ত ছিলে। (ইউসূফ:৪)

প্রমাণিত ঐতিহাসিক তথ্য কি যা কুরআন পরিষ্কার বর্ণনা করছে। সূরা ইউসূফের বেশীর ভাগ অংশ হযরত ইউসূফ (আ.)-এর অবস্থার বর্ণনা সম্বলিত। এ (জীবনীর) অবস্থার সারাংশ হচ্ছে, হযরত ইউসূফ (আ.) মিসরের কাফের বাদশাহ ফেরআউনের কাবিনায় সম্পদের তত্ত্বাবধানের জন্য কোষাগারের মন্ত্রী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। বাদশাহ যদি মনে করত হযরত ইউসূফ (আ.) বিশ্বস্ত নয়, আর নাউযুবিল্লাহ কপটতা মূলক ভাবে আনুগত্য করছেন। তা হলে কখনো নিজ কাবিনায় তাকে অর্ন্তভূক্ত করত না, আর এমনিতে হযরত ইউসূফ (আ.) সম্পর্কে এমন ধারণা করা বে আদবীর অন্তভূর্ক্ত। নাউযুবিল্লাহ হৃদয়ে তিনি মিশরের ফেরআউনের বিরুদ্ধে হিংসা ও বিদ্বেষ রাখতেন কিন্তু বাহ্যত তিনি কপটতা প্রদর্শন করে তার্ আনুগত্য প্রদর্শন করতেন, তার বিশ্বস্ততা প্রকাশ করতেন।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এভাবেই আমরা ইউসুফের জন্য পরিকল্পনা করেছিলাম আল্লাহ্ যদি না চাইতেন তহলে সে তার নিজের ভাইকে বাদশাহের রাজত্ব থেকে (নিজের কাছে) ধরে রাখতে পারত না। (সূরা ইউসুফ) অর্থাৎ ইউসুফ (আ.) মিশরের বাদশাহ্‌র

আইন অনুসারে তার আপন ভাইকে মিশরে আটকে রাখার অধিকার রাখতেন না। তাই আল্লাহ্ তাআলা এ পরিকল্পনা করেছেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে ভুলিয়ে সরকারী পন্য মাপার বাটখিরা যেটি ছিল সেটি নিজের ভাইয়ের পন্যে রাখিয়ে দিলেন। অনুসন্ধানে তার ভাইয়ের পন্য থেকে সেই পরিমাপ বেরিয়ে আসে। এ থেকে বুঝা যায়, হযরত ইউসুফ (আ.) মিশরের কাফের ও মুশরিক বাদশাহের আইনের অধিনস্ত ছিলেন। জাগতিক বিষয়াদিতে হযরত ইউসুফ (আ.) কাফের বাদশাহের নিয়মের আনুগত্য আর বিশ্বস্ততার সাথে আনুগত্য সত্ত্বেও ধর্মীয় বিষয়াদিতে তার ভ্রান্ত বিশ্বাসসমূহের অনুসরণ ও আনুগত্য করতেন না।

অত:পর কুরআন করীমের এক জায়গায় আল্লাহ্ তাআলা বলেন, **'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমর মিনকুম'** এ ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শাহাদুতুল কুরআনে বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রাসূল এবং নিজেদের বাদশাহ্-এর আনুগত্য কর। (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ খন্ড, পৃ: ৩৩২)

অত:পর একদা তিনি বলেন, অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল এবং শাসকদের আনুগত্য কর, বাদশাহ্-এর আনুগত্য অবলম্বন কর। (আলহাকাম ১০ ফেব্রুয়ারী ১৯০১, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১)

অত:পর অন্য এক জায়গায় বলেন, হে মুসলমানগণ! কোন বিষয়ে তোমরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত হলে সেই বিষয়ের সিদ্ধান্তের জন্য আল্লাহ্ এবং রাসূলের উপর দায়িত্ব ন্যস্ত কর যদি তোমরা আল্লাহ্ এবং পরকালে ঈমান রাখ তাহলে এমনটিই কর আর (এটিই) পরিণামের দিক থেকে উত্তম। (এযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৯৬)

তিনি (আ.) বলেন, যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মাঝে বিতন্ডা হয় তাহলে সেই বিষয়টিকে আল্লাহ্ ও রাসূল-এর দিকে প্রত্যার্পণ কর। আল্লাহ্ এবং রাসূলকে বিচারক কর অন্য কাউকে নয়। (আল হক্ব মোবাহেসা দিল্লী, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৮৪)।

আর আল্লাহ্ ও রাসূলের সিদ্ধান্ত যেভাবে পূর্বে আমি বলে এসেছি, সাধারণ জাগতিক অবস্থায় মু'মিনের উপর পরিস্থিতি যা-ই আসুক না কেন তথাপি বিদ্রোহ করবে না। যদি কুফর দেখ বা কুফরের নির্দেশ পাও তা হলে সেক্ষেত্রে আনুগত্য সেই পর্যন্ত যেখানে কুফর ছাড়া অন্য বিষয় রয়েছে এছাড়া আনুগত্য নয় কিন্তু তথাপি বিদ্রোহের অনুমতি নেই।

অন্যত্র এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, কুরআন শরীফে নির্দেশ এসেছে, **'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরে মিনকুম'**-এখানে 'উলিল আমরে মিনকুম'–এর পরিষ্কার আনুগত্যের নির্দেশ রয়েছে। কেউ যদি মনে করে সরকার 'মিনকুম'-এর অন্তর্ভুক্ত নয় তাহলে এটি তার প্রকাশ্য ভ্রান্তি। সরকার যে নির্দেশ শরিয়ত সম্মত দেয় তা 'মিনকুম'-এর অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণস্বরূপ যারা আমাদের বিরোধীতা করে না তারা আমাদের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের স্পষ্ট ইশারা থেকে প্রমাণিত যে, সরকারের আনুগত্য করা উচিত, আর তার কথা মেনে নেয়া উচিত। (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৭১, রাবওয়া থেকে প্রকাশিত)

তিনি (আ.) বলেন, শাসক যদি অত্যাচারী হয় তাহলে তার বদনাম করে বেড়িও না বরং নিজের অবস্থার সংশোধন কর। খোদা তাকে পাল্টে দিবেন অথবা তাকেই পুণ্যবান করে দিবেন। যে কষ্ট আসে তা নিজের অভ্যন্তরীণ মন্দ কর্মের কারণে আসে। নতুবা মু'মিনের সাথে খোদার সাহায্য থাকে। মু'মিনের জন্য আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং উপকরণের ব্যবস্থা করেন। আমার উপদেশ এটিই তোমরা সকল দিক থেকে পুণ্যের আদর্শ হও। খোদার অধিকারও খর্ব করবে না আর বান্দার অধিকারও খর্ব করবে না। (আল হাকাম, ২৪ মে ১৯০১, ১৯ খন্ড, ৫ম পৃ:, ৯ কলাম)

এগুলো হচ্ছে পুণ্যের দৃষ্টান্ত যা আহমদীদেরও প্রতিষ্ঠা করা উচিত বরং আহমদীদেরই প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বলতে কেবল মুসলমান শাসক নয়, এ সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'উলিল আমরে মিনকুম' "কোন কোন মুসলমান ভুলবশত এ আয়াতের এ অর্থ মনে করে যে, এ নির্দেশ কেবল মুসলমান শাসকদের জন্য, তাদের আনুগত্য করা উচিত কিন্তু এ কথা ভুল আর কুরআনের নীতির পরিপন্থী। নি:সন্দেহে যদিও এখানে 'মিনকুম' শব্দ রয়েছে কিন্তু 'মিনকুম' এর অর্থ এটি নয় যে, যারা তোমাদের স্ব ধর্মের অনুসারী এবং এটির অর্থ এই যে, যারা তোমাদের মধ্য হতে শাসক নিযুক্ত হয়। 'মিন' এ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা কাফেরদের সম্বোধন করে বলেন, **'আলাম ইয়াতিকুম রাসুলুম মিনহুন'** (সূরা আনআম : ১৩১) এ আয়াতে যদি 'মিনকুম'-এর অর্থ স্ব ধর্ম করা হয় তাহলে এটির অর্থ এই হবে যে, 'নাউযুবিল্লাহ্ মিন যালেক' রাসূল কুফ্‌ফারদের স্ব ধর্মের অনুসারী ছিলেন। সুতরাং আবশ্যক নয় যে 'মিনকুম' স্বধর্মের অর্থেই হবে। এটি অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। এ জায়গায় এটির অর্থ এটিই যে, তোমাদের দেশের যারা শাসক (তাদের আনুগত্য কর)। অর্থাৎ এটি নয় যে, যে (স্ব ধর্মের) শাসক হবে তার আনুগত্য করে বরং যারা তোমাদের শাসক হবে তাদের আনুগত্য কর। আর –'ফা ইন্ তানায'তুম ফী শাইয়িন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহে ওয়া রাসূলে' –এর অর্থ এ নয় যে কুরআন এবং হাদীসের আলোকে সিদ্ধান্ত করে নাও বরং এটির অর্থ এই যে, যদি শাসকের সাথে বিবাদ হয় তবে সেটিকে খোদা এবং তাঁর রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর আর সেই নির্দেশ এটিই যে, শাসককে তার ভ্রান্তি সম্পর্কে অবগত করতে হবে। যদি সে না মানে তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলার উপর ছেড়ে দিতে হবে। তিনি নিজে সিদ্ধান্ত নিবেন আর অত্যাচারিকে তার আচরণের শাস্তি দিবেন।"

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনায় আমি যেভাবে বর্ণনা করে এসেছি তিনিও এই দলিল দিচ্ছেন, তিনি বলেন, "কুরআন করীমে যেভাবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে সেটিও প্রমাণ বহন করে যে, শাসক যে কোন ধর্মের হলেও তার আনুগত্য আবশ্যক। বরং যদি তার নির্দেশ এমন যে শরিয়তের নির্দেশের পরিপন্থী যার সম্পাদন করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব সে ক্ষেত্রেও আনুগত্য আবশ্যক। যেমন হযরত ইউসুফ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যখন তার ভাইয়েরা তার ছোট ভাইকে তার নিকট নিয়ে আসল তখন তিনি তার ভাইকে সেখানকার বাদশাহ্-এর নিয়ম অনুযায়ী তার নিকট রাখতে পারতেন না এ জন্য খোদা স্বয়ং তার জন্য একটা পরিকল্পনা করলেন তদ্রূপ তিনি সামনে এগিয়ে বলেন, এই আয়াত, 'ইজআ'লীন খাযায়েনেল আরযে' (সূরা ইউসুফ : ৫৬) এর তফসীরে ফাতহুল বয়ানে তফসীর করা হয়েছে, এ আয়াত থেকে এ প্রমাণ দেয়া হয়েছে যে, অত্যাচারী বা কাফের বাদশাহ্-এর পক্ষ থেকে দেয়া পদ সেই ব্যক্তির জন্য গ্রহণ করা বৈধ যে নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রাখে যে সে সত্যের উপর

প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে। স্মরণ রাখা উচিত, সত্য প্রতিষ্ঠার অর্থ এ নয় যে, নিজের শরিয়ত চালাতে পারবে। যেমন কিনা ইউসুফ (আ.)-এর ভাই এর বিষয় থেকে বুঝা যায়, কাফেরের চাকুরীর জন্য এ শর্ত নেই যে মু'মিন ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণা চালাতে পারবে। সুতরাং সত্যের হিফাযতের অর্থ হল অন্য বিষয়ে শামেল হবে না। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর বিষয় থেকেও পরিষ্কার যে, সরকার কাফের হলেও তার প্রতি বিশ্বস্ততা আবশ্যক। (আনোয়ারুল উলুম ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৫৯, ২৬০)। শাসকদের মতভেদ হলে কি করা উচিত এ সম্পর্ক আরও ব্যাখ্যা। পূর্বেও বর্ণনা এসেছে যে, শাসক শুধু মুসলমান হলে তাদের আনুগত্য করতে হবে বা এই যে নির্দেশ যা এটি ভয়ের জন্য এসেছে। এ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.) কি বলেছেন? তিনি (সা.) পূববর্তী খলীফাদের সম্পর্কে বলেছেন, আমি তোমাদের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছি যে, যদি কোন কৃষ্ণাঙ্গ কৃতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় তথাপি (তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর আর আনুগত্য এবং বধ্যগত হওয়াকে নিজের আচরণ বানিয়ে নাও। আমার পরে যারা জীবিত থাকবে তারা মানুষের মধ্যে অনেক বড় মতভেদ দেখবে। সুতরাং এমন সময় তোমাদের জন্য একটিই আমার তাকিদপূর্ণ নির্দেশ যে, তোমরা আমার সুন্নত আর আমার পরে আগত খোলাফায়ে রাশেদীনদের সুন্নতকে আকড়িয়ে ধরবে। 'তামাস্‌সাকু বেহা তোমরা এ সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আকড়িয়ে ধরবে। যেভাবে কোন জিনিসকে দাঁত দিয়ে আকড়ে ধরে রাখা হয় সেভাবে ঐ সুন্নতের সাথে চিমটে থাকবে আর কখনো আমার এবং আমার খোলাফায়ে রাশেদীন-এর পথ পরিত্যাগ করবে না। এটি মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বাল-এর হাদীস।

জাগতিক শাসকদের সম্পর্কে শিক্ষা কি? বুখারীর এ হাদীসেই তিনি (সা.) বলেন, "তোমরা আমার পর এমন অবস্থা দেখবে যে, তোমাদের সাথে অন্যায় করা হচ্ছে" (এটির বর্ণনা পূর্বে এসে গেছে, এটি পার্থিব শাসক যারা আছেন তাদের জন্য) "তোমাদের অধিকার পদ দলিত করা হবে আর অন্যদেরকে তোমাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হবে। এমন বিষয় তোমাদের চোখে পড়বে যা তোমরা অপছন্দ করবে। সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এমন পরিস্থিতিতে আমাদের জন্য আপনার নির্দেশ কি? তিনি (সা.) বলেন, এমন শাসকদের প্রাপ্য তাদের দিবে আর নিজের অধিকার আল্লাহ্‌র নিকট চাইবে। [সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল ফিতান বাব কৃওলুন্ নবী (সা.), সাতারুনা বা'দী আমুরান তকব্বারুনাহা হাদীস নম্বর :৭০৫২] মুসলিমেও এর অনুরূপ একটি হাদীসে আছে যার অনুবাদ হচ্ছে, শাসক অনেক অত্যাচারী এবং আত্মসাৎকারী হলেও তার আনুগত্য করবে। সুতরাং অত্যাচারী সরকারের প্রতিও আনুগত্যের হক আদায় করা উচিত। (সহী মুসলিম, কিতাবুল, মাসরত) তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না আর তার আনুগত্য অস্বীকার করা যাবে না বরং এমন কষ্ট দূর কার জন্য এবং তার সংশোধনের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট বিগলিত চিত্তে দোয়া করা উচিত।

একজন আহমদীকে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, সে কোন শর্ত স্বাপেক্ষে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছে। উদাহরণস্বরূপ বয়আতের দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, "মিথ্যা, ব্যাভিচার, কুদৃষ্টি, প্রত্যক পাপ, অবাধ্যতা অন্যায় অত্যাচার ও আত্মসাৎ অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ থেকে দূরে থাকবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হোক না কেন সেটির শিকারে পরিণত হবে না।

আর চতুর্থ শর্ত হচ্ছে, "উত্তেজনার বশে অন্যায়ভাবে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষত: কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কোন কষ্ট দিবে না।" (মজমুয়া ইশতেহারাত প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৯ রাবওয়া থেকে মুদ্রিত)

অত:পর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, 'আল ফিতনাতু আকবারু মিনাল কতল' (সূরা বাকারা : ২১৮) বিদ্রোহ ছড়ানো অর্থাৎ শান্তিকে বিঘ্নিত করা, হত্যার চেয়ে বড়। (জঙ্গে মোকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, পৃ: ২৫৫) তিনি (আ.) বলেন, 'উলিল আমর' বলতে জাগতিকভাবে বাদশাহ্ এবং আধ্যাত্মিক ভাবে যুগ ইমাম। জাগতিক ভাবে যে ব্যক্তি আমাদের উদ্দেশ্যের বিরোধী নয়, তার দ্বারা যদি আমরা ধর্মীয় উপকার পাই (তাহলে) সে আমাদেরই মধ্য হতে" (জরুরতুল ইমাম, রূহানী খাযায়েন, ১৩ খন্ড, পৃ: ৪৯০) তিনি (আ.) আরও বলেন, খোদা না করুন যদি এমন কোন স্থানে প্লেগ ছড়িয়ে পড়ে যেখানে তোমাদের কেউ থাকে তবে আমি তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছি, সরকারের প্রথম আনুগত্যকারী যেন তোমরা হউ। অনেক জায়গাতে শুনা গেছে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে, আমার মতে সরকারের আইনের বিরুদ্ধে যাওয়া বিদ্রোহ বা ভয়াবহ অপরাধ। হ্যাঁ, নিশ্চিত সরকারের এটি দায়িত্ব যে, তারা এমন অফিসার নিযুক্ত করবে যারা উত্তম স্বভাবের অধিকারী, ভদ্র, দেশীয় রীতি নীতি এবং ধর্মীয় বিধি নিষেধ সম্পর্কে অবগত থাকবে। বস্তুত: তোমরা নিজেরা এই নিয়মগুলো মেনে চল আর নিজেদের বন্ধু-বান্ধব এবং প্রতিবেশীদের এ নিয়মগুলোর উপকার সম্পর্কে অবহিত কর। (মলফুযাত, প্রথম খন্ড, পৃ: ১৩৪ নতুন সংস্করণ)

অত:পর একদা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি হরতাল হয়। এটি সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "বিশৃঙ্খল ছাত্রদের সঙ্গ অবলম্বন করার যে পদ্ধতি এটি আমাদের শিক্ষা এবং পরামর্শের বিরোধী। এজন্য সে ঐ দিন থেকে বিদ্রোহীর অন্তর্ভুক্ত।"

(অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এক আত্মীয় সম্পর্কে এ কথা বলেছেন) অত:পর তিনি (আ.) আরও বলেন, ছাত্ররা যখন লাহোরে নিজেদের প্রফেসরদের বিরোধীতায় স্ট্রাইক করেছে তখন যে সমস্ত ছাত্ররা এ জামা'তভুক্ত ছিল তাদেরকে আমি নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন এ বিরোধীতায় অংশ না নেয়। আর নিজেদের শিক্ষকদের নিকট ক্ষমা চেয়ে তৎক্ষণাত কলেজে প্রবেশ করে। তাই তারা আমার নির্দেশ মান্য করে আর নিজেদের কলেজে প্রবেশ করে এমন এক পুণ্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে যে অন্য ছাত্ররাও তাৎক্ষণিক ডুকে পরেছে।" (মলফুযাত ৫ম খন্ড, পৃ: ১৭২-১৭৩ নতুন সংস্করণ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আওয়াল (রা.)-এর এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা কি? তিনি (রা.) বলেন, "প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহ্, রাসূল এবং উলিল আমরের এতায়াত আবশ্যক। উলিল আমর যদি আল্লাহ্ এবং নবীর প্রকাশ্যে নির্দেশের বিরোধীতা করে তাহলে মুসলমান সহ্য ক্ষমতা অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিগত এবং স্বত্ত্বগত বিষয়ে উলিল আমরের নির্দেশ মান্য করা উচিত। অথবা তার দেশ ছেড়ে দেয়া উচিত। 'আতিউল্লাহা ওয়া আতিউর ওয়া উলিল আমর মিনকুম' কুরআনের স্পষ্ট নির্দেশ........প্রথম শাসক এবং বাদশাহ্ আর দ্বিতীয় পর্যায়ে আলেমও বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ।" (আল বদর, নম্বর ৮ খন্ড ২৬.৯ ডিসেম্বর ১৯০৯ পৃষ্ঠা-৪, কলাম : ২)

অনেকে এ প্রশ্নও করেন, কাশ্মিরিদের পক্ষে

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হিন্দুস্থানের মুসলমানদের সাথে মিলে যে জলসা এবং মিছিল করেছিলেন, আর এর অনুমতি দিয়েছিলেন তাই মানুষ মনে করে, এই যে পদ্ধতি ছিল, এটিও সেই পদ্ধতি যা আজকালের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে। তাই এ কারণে এটি জায়েজ। অথচ এটি তাদের (কাশ্মিরিদের) অধিকার আদায় করে দেয়ার জন্য বাহিরের একটি আওয়াজ ছিল, মিছিল এবং জলসা ছিল, কোন ঝগড়া, ভাংচুর ছিল না। সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল যে কাশ্মিরিদের অধিকার পদদলিত করা হচ্ছে। সেটি আদায় করা হউক। তাদের সম্পত্তি কেবল নামে মাত্র। তাদের সম্পূর্ণ সম্পত্তির আয় রাজার হাতে চলে যায়। সুতরাং তাদের অধিকারের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে, তাদের অধিকার তাদেরকে দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যা হোক ১৯২৯ সনের ২৯ নভেম্বর-এর হরতাল সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে আহমদীদের এ ব্যাপারে আচরণ কেমন হওয়া উচিত? সেই প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, "হরতালে অংশগ্রহণ করা উচিত নয়। হ্যাঁ, জলসা এবং মিছিলের যতটুকু সম্পর্ক তা ঠিক আছে। কেননা সরকার এক পর্যায় পর্যন্ত এটির অনুমতি দিয়ে রেখেছে। কিন্তু হরতাল, দোকান বন্ধ রাখা আর ভাংচুর করা এ বিষয়গুলো সিদ্ধ নয়।

অত:পর "একজন ভদ্রলোক বলেন, শহরে যেহেতু আহমদীদের দোকান অনেক কম থাকে এ জন্য যদি এগুলো খোলা রাখা হয় তাহলে আক্রমণের আশংকা থাকে আর মানুষ লাঠি দ্বারা বন্ধ করিয়ে দেয়।" এতে তিনি (রা.) বলেন, "যদি কেউ লাঠি দ্বারা বন্ধ করিয়ে দেয় তাহলে বন্ধ করে দেয়া উচিত। আর পুলিশে গিয়ে সংবাদ দেয়া উচিত যে আমরা দোকান খোলতে চাই কিন্তু অমুক ব্যক্তি আমাদের খোলতে দেয় না। পুলিশকে যদি নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয় তাহলে খোলে নিতে পারে নতুবা প্রয়োজন নেই।"

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করেন আইনগতভাবে কি হরতাল নিষিদ্ধ? হুযূর (রা.) বলেন, "আইনের প্রশ্ন নয়। এমনিতেও এটি একটি বাজে জিনিস, যাতে ক্রেতা এবং দোকানদার উভয়ের ক্ষতি হয়, এখন ২৯ তারিখে যে মুসলমান বাহির থেকে লাহোর বা নিজের নিকটবর্তী শহর সমূহে পন্য ক্রয় করতে যাবে তারা বাধ্য হয়ে হিন্দুদের দোকানেই যাবে। (কেননা মুসলমান হরতাল করেছে) যার কারণে মুসলমানদেরও ক্ষতি হবে। (আল ফযল পত্রিকা, ১০ ডিসেম্বর ১৯২৯, ৪৭ নম্বর, ১৭ খন্ড, পৃ: ৬, কলাম-১)

অত:পর একদা তিনি (রা.) আইন ভংগের উপদেশ দাতাদের আমরা কখনো সাহায্য করতে পারি না। "কতক জামা'ত এমন রয়েছে যারা বিদ্রোহের শিক্ষা দেয়, কতক হত্যা এবং রাহাযানির শিক্ষা দেয়, কতক আইনের মান্যতাকে আবশ্যক মনে করে না। এ সমস্ত বিষয়ে কোন জামা'তের সাথে আমাদের সহযোগিতা হতে পারে না। কেননা এটি আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার পরিপন্থী বিষয়। আর ধর্মের অনুসরণ এত জরুরী যে, সমস্ত সরকার যদি আমাদের বিরোধী হয়ে যায় আর যেখানেই কোন আহমদীকে দেখে, তাকে ক্রুশে লটকিয়ে দেয়া আরম্ভ করে, তথাপিও আমাদের এ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হতে পারে না। দেশীয় আইন এবং শরিয়তের আইন যেন কখনোও ভঙ্গ না করা হয়। এ কারণে যদি আমাদের কঠিন কষ্ট দেয়া হয় তথাপি আমাদের জন্য বৈধ নয় যে আমরা এর বিরুদ্ধে চলব।" (আল ফযল, ৬ আগষ্ট ১৯৩৫, ২৩ খন্ড, পৃ: ১০, কলাম-৩)

সুতরাং হরতাল সম্পর্কে সমস্ত নির্দেশাবলী যা রয়েছে তা সম্পূর্ণ পরিস্কারভাবে সামনে এসে গেছে। আমি পূর্বেও হাদীসের ব্যাখ্যায় সূরা বাকারার ২০৬ নম্বর আয়াতের এক অংশ শুনিয়েছি ওয়াল্লাহু লা 'ইউহিব্বুল্ ফাসাদ' আল্লাহ্ তাআলা বিশৃঙ্খলাকে পছন্দ করেন না। যখন জোরজবরদস্তি আরম্ভ হয় তখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এখন দুর্ভাগ্যবশত এ বিশৃঙ্খল অবস্থায় সবচেয়ে বেশি মুসলমান দেশগুলো এতে প্রভাবিত হচ্ছে। এই বিষয়ে সম্পূর্ণ আয়াত হচ্ছে

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝۲۰۶

আর যখন সে শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয় তখন সে অশান্তি সৃষ্টি করার আর ক্ষেত খামার ও মানব প্রজন্মকে বিনাশ করার উদ্দেশ্যে দেশময় ছুটে বেড়ায়। অথচ আল্লাহ্ বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না। (বাকারা : ২০৬)

সরকার যখন অত্যাচারী হয়ে যায় তখন তারা অন্য বিরোধীদের সাহায় সম্পদ, তাদের ফসল, তাদের সন্তান-সন্ততিদের নির্বিচারে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এ সম্পূর্ণ আয়াত শাসকদের সতর্ক করছে। কেননা আল্লাহ্ তাআলার সার্বজনীন নির্দেশও হচ্ছে, 'ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুল্ ফাসাদ' এজন্য বিদ্রোহকারীদের জন্যও এটিই নির্দেশ।

অতএব আমি যেভাবে শুরুতেই বলেছিলাম যে, কুরআন করীম কেবল সাধারণ জনগণকেই নির্দেশ দেয় না বরং শাসকদেরও এটিই বলে, নিজেদের ক্ষমতার অহংকারে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে না। জনগণের অধিকার খর্ব করবে না। ধনী গরীবের পার্থক্য এতটা বৃদ্ধি করবে না যে, সাধারণের ভিতর ব্যাকুলতা দেখা দিবে আর এরই ফলশ্রুতিতে বিদ্রোহ-এর অবস্থা সৃষ্টি হবে। এভাবে তোমরা তোমাদের এ কর্মের কারণেও খোদার নিকট ধৃত হবে।

এখন দেখুন! যে অবস্থা সামনে আসছে বিনা ব্যতিক্রমে সব জায়গায় এ আওয়াজই উচ্চারিত হচ্ছে যে, জাতীয় সম্পদ লুন্ঠন করা হচ্ছে আর জনগণকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। কত দুর্ভাগ্য! যে সকল লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা বিশেষভাবে নসিহত করেছিলেন, আর সতর্ক করে ছিলেন, তাদের মধ্য থেকে সর্বাগ্রে এ মানুষ যারা আজকাল মুসলমান দেশসমূহের শাসক। যারা এ ধরণের অপকর্ম করে যাচ্ছে। জনগণের জানমালের হেফাযত তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি, তাদের স্বাস্থ্যের দেখাশুনা তদ্রূপভাবে আরও অনেকগুলো দায়িত্ব যা এ সকল সরকারের কাজ, এগুলোর দায়িত্ব পালন করা উচিত। এ দায়িত্বগুলো সম্পাদন না করে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, আর যেভাবে আল্লাহ্ বলেন, বিশৃঙ্খলা আল্লাহ্ তাআলার দৃষ্টিতে অত্যন্ত অপছন্দনীয়। তাই আমাদের শাসকদের আল্লাহ্ তাআলার এ পুরস্কারের মূল্যায়ণ করে এই নিয়ম এবং দৃষ্টান্ত অনুযায়ী চলার চেষ্টা করা উচিত, যার উদাহরণ আমরা দিয়ে থাকি। হযরত উমর (রা.) রাজ্যে কেমন ন্যায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? পুণরায় খৃষ্টানদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা কেঁদে কেঁদে দোয়া করেছিল মুসলমান পুণরায় আমাদের শাসক হোক। আর এখানে অবস্থা এই যে, মুসলমান প্রজা মুসলমান শাসকদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। সুতরাং সেই তাক্ওয়া অনুসন্ধান প্রয়োজন যা মুসলমানদের থেকে শেষ হয়ে গেছে, উঠে গেছে। শাসক বা সাধারণ জনগণ উভয়ে এই নীতি অবলম্বন

করলে সফলকাম হবেন। যাই হোক আহমদীদের জন্য পরিস্কার দিকনির্দেশনা যে, নিজেদেরকে এ বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচাতে হবে। দোয়া করুন, হৃদয় থেকে উৎসারিত দোয়াগুলো এক সময় আল্লাহ্ চাইলে গ্রহণীয়তার মর্যাদা পাবে। এ অত্যাচারীদের থেকে, শাসক যদি অত্যাচারী হয় তাহলে মুক্তিলাভ হবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সম্মুখেও পরিবর্তনের পর যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে তাতে সম্ভবত সাময়িক শান্তি তো হতে পারে তবে স্থায়ী শান্তি আসবে না। এভাবে যে পরিবর্তন সৃষ্টি হয় যা অত্যাচারের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করা হয় বা পরিবর্তন আনা হয় তাতে তাদের মধ্যেও এক সময় পর পুণরায় অত্যাচারী না সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে। এক অত্যাচারী গত হওয়ার পর আরেক অত্যাচারী এসে যায়। এজন্য দোয়াও করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন কখনও আমাদের উপর অত্যাচারী শাসক নিযুক্ত না করেন। আল্লাহ্ করুন সাধারণ মুসলমান শাসকগণও নিজ নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্যকে বুঝুন। অত:পর সেগুলো আদায়ের চেষ্টা করুন। ইসলামের মনোরম শিক্ষা পৃথিবীর সম্মুখে উপস্থাপন করুন।

জুমুআর নামাযের পর আমি কয়েকটি নামাযে জানাযা গয়েব পড়াব। প্রথম জানাযা মোকাররম সৈয়্যদ আব্দুল হাই শাহ সাহেব, নাযের ইশায়াত, আঞ্জুমানে আহমদীয়া রাবওয়াহ-এর স্ত্রী আমাতুল ওয়াদুদ সাহেবার। দুইদিন পূর্বে হঠাৎ ব্লাড প্রেসার হাই হয়, হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, ব্রেইন হেম্বারেজ হয় আর ২৫ মার্চ সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

তাঁর বয়স ছিল ৭২ বছর। শ্রীনগরের অধিবাসী শেখ মাহবুব এলাহী সাহেব যিনি একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন মরহুমা তাঁর মেয়ে। তিনি (শেখ সাহেব) নিজে হিন্দু ধর্ম পরিত্যাগ করে আহমদী হয়েছিলেন। তাঁর পূর্বের নাম রাধা কৃষ্ণ ছিল। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) শেখ সাহেবকে কাদিয়ানে এনে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরে তিনি ধর্মের সেবায় নিয়োজিত হন।

মরহুমার মা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী খাজা আযীয ডার সাহেব পিতা হযরত হাজী উমর ডার সাহেবের মেয়ে ছিলেন। (মরহুমা) অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী পরিবারের ছিলেন তথাপি ওয়াকফে জিন্দেগীর সাথে বিয়ে হলে নিজের ওয়াকফের দায়িত্ব উত্তমভাবে পালন করেন। সর্ব অবস্থা সন্তুষ্টির সাথে অতিবাহিত করেন। মিশুক এবং দরিদ্র প্রতিপালনকারিনী ছিলেন। ছয় সাত বছরের একটি মেয়ে পোষ্য নিয়ে লালন-পালন করেছেন, তরবিয়ত করেছেন, শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন আর নিজের খরচে তার বিয়েও দিয়েছেন। তিনি আমাদের Humanity First-এর চেয়ারম্যান আহমদ ইয়াহিয়া সাহেবের মা ছিলেন।

দ্বিতীয় জানাযা লাহোরের চৌধুরী মোহাম্মদ শরীফ সাহেবের ছেলে মোহাম্মদ সাঈদ আশরাফ সাহেবের। তিনি একটি সড়ক পার হওয়ার সময় ২৭ মার্চ দুর্ঘটনার শিকার হন। তিনজন মোটর সাইকেল চালক তাকে ধাক্কা দেয়। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী দু'জনে যাচ্ছিলেন। স্ত্রী আঘাত প্রাপ্ত হন। তিনি মরহুম সেখানে পাশে পরে যান আর মোটর সাইকেল তাঁর উপর দিয়ে চলে যায়। যাই হোক ভর করে উঠেন আর অটো রিকশা থামিয়ে হাসপাতালে যাচ্ছিলেন কিন্তু হাসপাতালে গিয়ে যখন সেখানে ব্যান্ডেজ করেন তখন দশ মিনিটও পার হয়নি শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আর সেখান মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

তাঁর নানা ফযল দ্বীন সাহেব আর নানী হাসান বিবি উভয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। জামা'তের সাথে বিশ্বস্ততা আর খিলাফতের সাথে অত্যাধিক বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক ছিল। জামায়াতী কাজে অংশগ্রহণকারী ছিলেন। তাঁর এক ছেলে মোহাম্মদ আহসান সাঈদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলাহ, জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীতে শিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন। তিনি (মৃত্যুর সংবাদ শুনে) যেতে চাচ্ছিলেন তাঁর মা বলেন, ওয়াকফের কর্তব্য এটিই যে, তুমি এখানে এসো না আর নিজের দায়িত্ব পালন কর। দ্বিতীয় জানাযা যা পড়া হবে এটি তাঁর।

তৃতীয় জানাযা নঈমা বেগম সাহেবার, ওয়াহিউ, আমেরিকাতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রা.) বিশেষ চিকিৎসক ডাক্তার হাসমত উল্লাহ্ খান সাহেবের (রা.) মেয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় খিলাফত থেকে এখন পর্যন্ত খিলাফতের সাথে তাঁর গভীর আর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল। অত্যন্ত নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ত ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বলার প্রেক্ষিতে ইতিহাসে এম,এ করেছিলেন। জামেয়া নূসরাতে কিছু কাল পড়িয়েছিলেন। অত:পর বর্তমানে নিজের ছেলের কাছে আমেরিকায় বসবাস করছিলেন। এখানেও তিনি লাজনার কাজে অনেক বেশি অংশগ্রহণকারিনী ছিলেন। আল্লাহ্‌র ফযলে মুসীয়া ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর পদমর্যাদা উন্নত করুন।

পরবর্তী আরো একটি জানাযা নঈম আহমদ ওয়াসিম সাহেবের যিনি ৬ মার্চ আমেরিকাতে মৃত্যুবরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত হাজী মোহাম্মদ দ্বীন সাহেব থানভী (রা.)-এর ছেলে ছিলেন। তিনি (সাহাবী সাহেব) কাদিয়ানে দোয়ার মেশিন নামে পরিচিত ছিলেন। মরহুম অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, খোদার উপর ভরসাকারী এবং সিলসিলাহ্-এর জন্য ত্যাগী খাদেম ছিলেন।

জামা'তের প্রত্যেক তাহরীক সমূহে অনেক বেশি অংশগ্রহণকারী ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস, হযরত মির্যা নাসের আহমদ সাহেবের খিলাফতের পূর্বে দ্বিতীয় খিলাফতে কেন্দ্রের হেফাযতের তত্ত্বাবধান তাঁর দায়িত্বে ছিল তখন মরহুম তাঁর সাথেও কাজ করেছিলেন। রাবওয়াহ এর ভিত্তি প্রস্তর রাখার অনুষ্ঠানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর তিনি আমেরিকায় চলে যান। আমেরিকাতেও তিনি আনসারুল্লাহ্-এর কায়েদ মাল হিসেবে কাজ করছিলেন। কয়েক মাস পূর্বে হৃদরোগে আক্রান্ত হন আর অবস্থা যথেষ্ট খারাপ হয়েগিয়েছিল। সে সময়ও মসজিদের জন্য আনসারুল্লাহ্‌র প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল আর চাঁদা একত্রিত করছিলেন তখন জ্ঞান ফেরার পর প্রথম যে প্রশ্ন করেছেন সেটি এই ছিল মসজিদের হিসাব-নিকাশ ঠিক করা হয়ে গিয়েছে কি না? অথবা অমুক অমুক বিল আদায় করে দেয়ার ছিল সেগুলো হয়ে গিয়েছে কি না?

আল্লাহ্ তাআলা সকল মৃতদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তাদের পুণ্যগুলো তাদের বংশধরদের মাঝে জারী রাখুন। জুমুআর নামাযের পর এদের সবার জানাযার নামায হবে।

অনুবাদ : **মওলানা বশিরুর রহমান**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ।

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলীফা
হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) প্রদত্ত
বাংলাদেশের জন্য শান্তির বাণী

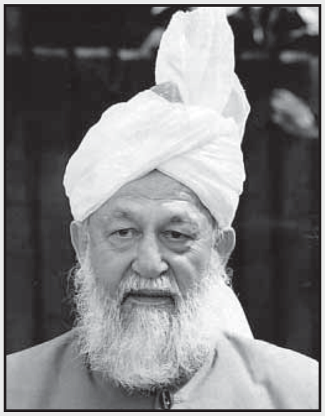

বাংলাদেশ সম্বন্ধে আমি কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। বাংলাদেশের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা আছে। আমি বেশ কয়েকবার বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি বাংলাদেশের সব এলাকা দেখেছি। আল্লাহ্ আপনাদেরকে খুবই সুন্দর একটি দেশ দিয়েছেন। এমন দেশ যা খুবই প্রিয়, খুবই সুন্দর। দেশের মানুষগুলোও খুবই সুন্দর। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে খুব দ্রুত আহমদীয়াতের বিস্তৃতি হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদী আলেমদের হুমকি সাধারণ ও নিরীহ মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। তারা তাদের হুমকিতে ভীত হয়ে পড়েন। আপনারা কেবলমাত্র আল্লাহকে ভয় করুন। মানুষের ভয়ে ভীত হবেন না। কাউকে গ্রাহ্য করবেন না। আল্লাহ্‌র ভয় হিকমত ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে এমন কথা বলুন, যা মানুষের হৃদয়ে স্থান লাভ করে, রেখাপাত করে। ভাল কথা বলুন। শত্রুকে ভয় করবেন না। মনে রাখবেন, শত্রুর প্রোপাগান্ডা ও অপপ্রচারের ফলে মানুষ প্রভাবান্বিত হয়ে যায়।

অতএব, আপনাদের জন্য জরুরী বিষয় এই যে, আপনারা আপামর জনতার কাছেই (দাওয়াত) পৌঁছাবেন। আমার ধারণা এই যে, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় বাংলাদেশের অধিকাংশ আলেমের মন স্বচ্ছ। তাঁরা সত্যিই ধর্মকে ভালবাসেন। তারা পাঞ্জাবী আলেমদের মত কট্টর ও দুষ্ট নন। এর প্রমাণ হলো এই যে, পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) আবির্ভূত হয়েছেন। যদি হিন্দুস্থানের পাঞ্জাবের আলেমরা আসলেই কট্টর না হতেন তাহলে সেখানে ইমাম মাহ্দী (আ.) আসতেন না। সবচে' খারাপ লোক যেখানে থাকে আল্লাহ্ তাআলা সে স্থানকেই তাদের সংশোধনের জন্য সতর্ককারী পাঠাবার স্থান হিসেবে চিহ্নিত করেন।

আল্লাহ্ তাআলা এই পাঞ্জাবেই হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-কে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন। আমি যেসব কথা বলছি তা কুরআন এবং হাদীসের উপর ভিত্তি করেই বলছি। বাংলাদেশের আলেমগণ কখনো দুষ্টামিতে পাঞ্জাবী আলেমদের সাথে পারবেন না। কোনক্রমে পাঞ্জাবীদের সাথে দুষ্টামিতে পাল্লা দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। প্রয়োজনে যতটা ইচ্ছা প্রতিযোগিতা করে দেখতে পারেন। যদি বুদ্ধিমত্তার সাথে যুক্তিসঙ্গত কথা বলা হয় তাহলে বাংলাদেশের অধিকাংশ ক্ষেত্রে উগ্র প্রকৃতির মৌলভীও নমনীয়-কমনীয় হয়ে যায়। হ্যাঁ, যাদের ভাগ্যে সংশোধন নেই এমন লোক সর্বত্রই কিছু না কিছু পাওয়া যাবে। যারা কথার মাঝে শোরগোল করে উঠে তাদেরকে পরিহার করুন। কিন্তু স্মরণ রাখবেন, অধিকাংশ আলেমের নিকট যাওয়া আপনাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাদের সাথে যুক্তি-প্রমাণ ও আন্তরিকতার সাথে কথা বলুন। বুঝাতে চেষ্টা করুন যে, আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালানো হচ্ছে। দেখবেন কত বিপুল সংখ্যক আলেম আমাদের সমর্থনে এসে যান। এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। জনসাধারণের মধ্যে যারা নেতৃস্থানীয় তাদের নিকট গিয়েও বলুন যা উলামাকে বলেছেন। ফলশ্রুতিতে এমন অনেক শ্রেণী আপনাদের সমর্থণে এসে যাবেন। আর তখন আহমদীরা নির্ভয়ে আহমদীয়াতের প্রচার করার সুযোগ পাবেন।

প্রথমে আলেমগণের হৃদয় জয় করুন। জনপ্রতিনিধিদের মন জয় করুন, তারপর জনসাধারণের মন জয় করুন। এইরূপ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমাদের প্রচারকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন এমন হলে বাংলাদেশ এমন একটি বিরাট কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারে যেখানে খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে। মৌলভীরা ইসলামের নামে সরলমনা মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছে। তারা মানুষকে ইসলামের কোন দিক-নির্দেশনা দেয় না। তারা মানুষের প্রতি সহানুভূতি সমবেদনা রাখে না। মানুষ অনাহারে মরলেও এদের কোন চিন্তা নেই, নেই কোন মাথা ব্যথা। ইসলামী রাষ্ট্র তো এমন হবে যেখানে মানুষের দরিদ্রকে দূর করা হবে। কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক খোরাকেরই চিন্তা করা হবে না বরং দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক খোরাকেরও ব্যবস্থা করা হবে। বাংলাদেশের প্রতি আমার ভালবাস ও সমবেদনা আমাকে বলতে বাধ্য করেছে, তাই আমি আপনাদেরকে বলছি যে, আজ আপনাদের সকল প্রকার অভাব দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে আহমদীয়াত। দেশের দরিদ্র ও নৈতিক অধ:পতন, সামাজিক আপত্তি, যুলুম-অত্যাচার এই সব কিছুর হাত থেকে কেবলমাত্র আহমদীয়াতই আপনাদেরকে নিষ্কৃতি দিতে পারে–উদ্ধার করতে পারে। আমি আশা করি আপনারা আমার এই বার্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিবেন। খুব ভাল করে হৃদয়ঙ্গম করে নিন যা আমি বলছি। যে ব্যবস্থা-পত্র আমি দিয়েছি ইহাই সঠিক ব্যবস্থা পত্র এছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা-পত্র আপনারা কোথাও খুঁজে পাবেন না।

আমি বাংলাদেশের মন জয় করতে চাই। যতশীঘ্র সম্ভব এই মহা বিপ্লব সাধন করতে হবে। পাকিস্তানের মৌলভীরা বার বার বাংলাদেশের উপর আক্রমণ করছে যেন এদেশও পাকিস্তানের মত হয়। এমনিতেই আপনরা অনেক কষ্টে আছেন। আপনারা পাকিস্তানের মতই যদি হতে চান তাহলে কেন আপনারা এথেকে পৃথক হয়েছেন? পাকিস্তানের কথা ছেড়ে দিন। পাকিস্তানে যে নোংরা আবর্জনা ছেয়ে আছে তা আপনারা কিছুতেই গ্রহণ করবেন না।

আপনারা বড় বড় বুদ্ধিজীবী, পত্রিকার প্রতিনিধি, বড় বড় মিডিয়ার প্রতিনিধি এবং বড় বড় সম্মানিত জ্ঞানীজন রয়েছেন। আমি জানি তাদের হৃদয় সাক্ষ্য দেবে যে, আমি সত্য বলছি। অতএব আমার আবেদন এই যে, আমার কথা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আপনারা আমার কথার সমর্থন করুন। আমার এই বাণীটিকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিন। আল্লাহ্ আপনাদের সাথী হউন।

[হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে.)-এর ১৪-২-১৯৯৮ তারিখের পয়গাম থেকে সংকলিত]

হযরত উমর (রা.)

মূল: মাশহুদ আহমদ এবং ফজল আহমদ
ভাষান্তর: সিকদার তাহের আহমদ

(শেষ কিস্তি)

হযরত উমরের (রা.) মৃত্যু

হযরত উমর (রা.) অসময়ে মৃত্যু বরণ করেছিলেন। যোহরের নামাযের জন্য তিনি মুসুল্লিদের সুবিন্যস্ত করছিলেন। তখন বসরার অধিবাসী একজন অসন্তুষ্ট পারসী/ইরানি অমুসলিম, আবু লুলুয়াহ ফিরোজ তাকে (রা.) ছুরিকাহত করে। হযরত উমরের (রা.) প্রতি তার আক্রোশ ছিল। কারণ, মাত্র কিছু দিন আগে আবু লুলুয়াহ উমরের (রা.) কাছে একটি অভিযোগ নিয়ে এসেছিল, তার মালিক মুগিরাহ ইবনে সাবাহ্‌কে কতো টাকা পরিশোধ করতে হবে সে-ই বিষয়ে। সে হযরত উমরকে (রা.) অনুরোধ করেছিল এই অর্থের পরিমাণ যেন কমানো হয়। হযরত উমর (রা.) এই অভিযোগ শ্রবণ করেন এবং তাকে বলেন, টাকার অঙ্ক যুক্তিসঙ্গত। ঐতিহাসিকদের ভাষ্যে দেখা যায়, যেমন, তাবারিতে বলা হয়েছে: যখন উমর (রা.) নামায পড়া শুরু করেন, তখন আবু লুলুয়াহ নামাযের কাতার থেকে সামনে এগিয়ে আসে এবং তাকে (রা.) ছুরিকাহত করে। যখন আবু লুলুয়াহকে আটক করা হয়, তখন সে নিজেকে ছুরিকাঘাত করে। (তাবারি, ভলিউম: ১৪, পৃষ্ঠা: ৮৯-৯০)।

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে হযরত উমর (রা.) একটি শূরা গঠনের হুকুম দেন এবং সেই শূরাকে পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের দায়িত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন: 'তার জন্য, যে আমাকে অনুসরণ করবে। আমি আমার ইচ্ছা হিসেবে এটি প্রকাশ করছি যে, তাকে এই শহরের প্রতি দয়াদ্র হতে হবে, যে শহর আমাদেরকে একটি আবাস দিয়েছে। আর, ঈমানের বিষয়ে, তিনি যেন তাদের গুণাবলী বেশি দেখেন এবং তাদের দুর্বলতাগুলো হালকাভাবে দেখেন। এবং তিনি যেন আরব গোত্রগুলোর প্রতি সুব্যবহার করেন। কারণ, তারা ইসলামের শক্তি।'

(Helminski p. 410-411)

এর দু'দিন পর, ৬৪৪ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে, মাত্র ৬৪ বছর বয়সে হযরত উমর (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত উমরের (রা.) চরিত্র

সমস্ত জীবনব্যাপী সাহসের প্রকাশ দেখিয়ে গেছেন হযরত উমর (রা.)। খলীফা হিসেবে তিনি নম্রতা ও ভালবাসার প্রকাশও দেখিয়েছেন। তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী এবং সত্যনিষ্ঠ ছিলেন।

তাঁর চরিত্র সম্পর্কে হাদীস রয়েছে, যেখানে মহানবী (সা.) বলেছেন: 'সত্যিই আল্লাহ্ উমরের জিহ্বায় সত্য স্থাপন করেছেন এবং সে এর দ্বারা কথা বলে থাকে।' (আবু দাউদ, বই: ১৯, নং: ২৯৫৬)

তিনি সাদাসিধা জীবনযাপন করতেন, যার প্রকাশ ঘটেছে তার পোশাক-আশাকে এবং খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে। একবার তিনি তার ছেলে আসিমকে তিরস্কার করেছিলেন, কারণ, গোস্ত খেতে ভাল লাগতো বলে সে অধিকাংশ আহারকালে গোস্তই খেতো। আল-হাসানের এক বর্ণনায় দেখা যায়, হযরত উমর বলেন: 'যতবারই তুমি কোনো কিছু খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো, তুমি কি সেটাই খেয়ে থাকো? কোনো মানুষের বেহুদা অপব্যয়ের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে সবই খায় যা খেতে তার মন চায়।'

তিনি যেমন বাস্তববাদী মানুষ ছিলেন তেমনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও নৈতিকতা দ্বারা অন্যদেরকেও অনুপ্রাণিত করেছেন। সঙ্গী-সাথীদের গণ্ডি পেরিয়ে তার দয়াশীলতা এমনকি জীব-জন্তুর প্রতিও বিস্তৃত ছিল। একবার তিনি দেখলেন এক লোক একটি ছাগলের পা ধরে টেনে-হিচড়ে জবাই করতে নিয়ে যাচ্ছে। এটা তিনি পছন্দ করেন নি। তিনি লোকটিকে বললেন, 'ধিক তোমার প্রতি, যদি তুমি এটিকে জবাই করতে চাও, তবে তা যথাযথভাবে করো।'

খলীফা হিসেবে তিনি অনেক বড় দায়িত্ব অনুভব করতেন এবং দুর্বল ও গরিবদের প্রতি ভালবাসা রাখতেন। একবার হিজাজে ভয়াবহ রকমের দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। মিশর ও সিরিয়া থেকে কিছু সাহায্য-সহযোগিতা/ত্রাণ আসা সত্ত্বেও হযরত উমর (রা.) তার লোকদের এই দুর্দশা দেখে এতোটাই মুষড়ে পড়েন যে, তিনি সঙ্কল্প করেন: যতদিন এই দুর্ভিক্ষ থাকবে ততোদিন তিনি মাখন কিংবা মধু স্পর্শও করবেন না। এতে করে তার স্বাস্থ্যের প্রতি খারাপ প্রভাব পড়বে– তার সহকারীর এই মন্তব্যের পরও তিনি তার চোখে যা-কিছু বিলাস-ব্যসন তার সবই বর্জন করার সঙ্কল্পে অবিচল থাকেন। তিনি বলেন, "আমি যদি দুঃখ-কষ্টের স্বাদ গ্রহণ না করি, তাহলে কীভাবে আমি অন্যের কষ্টের কথা জানতে পারবো?"

খলীফা হিসেবে তার পদমর্যাদার অপব্যবহার না করার ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সতর্ক থাকতেন। দাপ্তরিক কাজের জন্য তিনি মাত্র একটি তেলের বাতি জ্বালাতেন। একবার তার পরিবারের এক সদস্যকে তিনি অর্থ প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এই কারণে যে, সে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র টাকা থেকে দিতে বলেছিল। পরবর্তীতে তিনি সেই ব্যক্তিকে ডেকে পাঠান এবং তার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তাকে দশ হাজার দিরহাম প্রদান করেন। (তাবারি, ভলিউম: ১৪, পৃষ্ঠা: ১০৭)। তবে তিনি মুসলমানদের খাত [অর্থাৎ সরকারি খাত] থেকে অর্থ খরচের বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন।

আরেক ঘটনায় হযরত উমর (রা.) সালমানের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেন, "আমি কি একজন বাদশাহ না খলীফা?" সালমান জবাব দেন, "আপনি যদি মুসলিম ভূখণ্ড থেকে এক দিরহাম অথবা তার চেয়ে কম বা বেশি অর্থ আদায় করেন এবং যে উদ্দেশ্যে এটি সংগ্রহ করা হয়েছে তার বিপরীতে ভিন্ন উদ্দেশ্যে খরচ করেন, তাহলে আপনি খলীফা নন, আপনি একজন বাদশাহ।" 'উমর অশ্রুপাত করেন এই ভেবে যে, তিনি যদি সামান্য টাকাও ভিন্ন উদ্দেশ্যে খরচ করে থাকেন।' (তাবারি, ভলিউম: ১৪, পৃষ্ঠা: ১১৮)। দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে এ রকমই ছিল তার মনমানসিকতা।

পক্ষপাতহীনতার প্রতি তার প্রখর দৃষ্টি ছিল। একবার তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় মদিনার এক আদালতে তাকে উপস্থিত হতে হয়। যখন তিনি আদালতে প্রবেশ করলেন, তখন বিচারক দণ্ডায়মান হয়ে তাকে সম্মান জানালেন। কিন্তু হযরত উমর এতে অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বিচারককে বললেন, "অভিযোগকারীর প্রতি প্রথমে আপনি এই অবিচারটা করলেন।"

উপসংহার

মহানবী (সা.)-এর প্রাথমিক যুগের সাহাবীদের (রা.) মধ্যে অনেকেই ছিলেন অসাধারণ নেতৃত্ব ও জ্ঞানের অধিকারী। এদের মধ্যে হযরত উমরের (রা.) ঘটনা এত কৌতুহল-উদ্দীপক

হওয়ার কারণ হলো তার চারিত্রিক রূপান্তর ঘটার বিষয়টি। ইসলামের কট্টর বিরোধী থেকে ইসলামের রক্ষকে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। আবেগপ্রবণ ও আগ্রাসী মনোভাবের মানুষ থেকে অত্যন্ত বিনয়ী ও মর্যাদাবান নেতায় রূপান্তরিত হওয়ার এই প্রক্রিয়ায়/সফরে, ব্যাপক দায়-দায়িত্ব বহন করা সত্ত্বেও তিনি আমাদের সবার জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের প্রভাববলয় যখন দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হচ্ছিল এবং গ্রেট রোমান (বাইজান্টাইন) ও পারস্য সাম্রাজ্য উভয়ই যখন তার নেতৃত্বের সামনে নতজানু হয়েছিল, তখন যদি সেসব বিজিত অঞ্চলের লোকেরা সবচেয়ে ক্ষমতাধর সেই ব্যক্তির শহরে ও বাড়িতে আগমন করতো, তাহলে তারা অতিকায় দালান-কোঠা, জাঁকজমক, – যা তারা রোম, কনস্টান্টিনোপল কিংবা টেসিফোন-এ [Ctesiphon] দেখে অভ্যস্ত,– দেখার পরিবর্তে অতি সাধারণ কাঁচা ইটের তৈরি বাড়িঘর ও মসজিদ দেখতে পেত। তারা এমন একজন নেতাকে দেখতে পেত যিনি মামুলি পোশাক পরিধান করেন, সাধারণ খাবার গ্রহণ করেন এবং বিশেষ কোনো ব্যবহার প্রত্যাশা করেন না। আহওয়ায-এর বিজিত শাসক হরমুজান একবার এই মহান খলীফার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। হরমুজানের পরনে ছিল রেশমী পোশাক, মাথায় ছিল মণিমাণিক্য খচিত মুকুট। কিন্তু সে তার মনিব ও প্রভু, ইসলামের এই মহান খলীফা হযরত উমরকে (রা.) দেখতে পেল মোটা কাপরের তৈরি, খসখসে ও তালি দেওয়া পোশাক পরিহিত অবস্থায়।

আঠার শতকে তার সম্পর্কে ঐতিহাসিক এডোয়ার্ড গিবন লিখেন: "উমরের মিতাচার ও দীনতা আবু বকরের গুণাবলীর চেয়ে কম নয়। তার খাবার ছিল বার্লির রুটি অথবা খেজুর; পানীয় ছিল সাধারণ পানি; তিনি যে গাউন/আলখাল্লা পরে ধর্মোপদেশ দেন তা ছেঁড়া এবং বারটি স্থানে তালি দেওয়া। আর পারসী/ইরানি সাত্রাপ/গভর্নর, যে এই বিজয়ীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি পেশ করতে এসেছিল, তাকে দেখতে পেয়েছিল মদিনার মসজিদের সিঁড়িতে ফকিরদের সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকতে।"

(The Decline and Fall of the Roman Empire, Vol. 5]

পরিশেষে, যদিও শিয়ারা দাবি করে যে, ক্ষমতার লোভে উমর (রা.) হযরত আলিকে (রা.) আরো আগেই খলীফা হওয়ার ক্ষেত্রে বাঁধা দিয়েছিলেন। কিন্তু, হযরত উমরের (রা.) কার্যকলাপ এর বিপরীত কথাই বলে। হযরত আলি (রা.) স্বয়ং হযরত উমরের (রা.) প্রশংসা করেছেন এবং তার অধীনে বিচারক হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি হযরত উমরের (রা.) মূখ্য পরামর্শদাতা হিসেবেও ভূমিকা রেখেছেন।

যদি কোনো লোক ব্যক্তিগত ক্ষমতা অর্জনের প্রত্যাশী হয়, তবে পদমর্যাদা লাভের পর সে অবশ্যই চেষ্টা করবে ক্ষমতা ও অর্থসম্পদের মাধ্যমে তার অবস্থান পোক্ত করতে। অধিকতর ক্ষমতা করায়ত্ব করার ফন্দিফিকির করতেও তাকে দেখা যাবে। হযরত উমরের (রা.) ক্ষেত্রে আমরা এর বিপরীত চিত্রই দেখতে পাই। তিনি কখনোই পদমর্যাদার আকাঙ্ক্ষা করেন নি। কিন্তু যখন তাকে এই পদমর্যাদা প্রদান করা হলো, তখন তিনি অভাবীদের কল্যাণসাধনে তৎপর হলেন এবং অতি সাদামাটাভাবে জীবনযাপন করে আমাদের সামনে উদাহরণ সৃষ্টি করলেন। রাজনৈতিক বিস্তৃতি তার মূল লক্ষ্য ছিল না, স্বাধীনতার প্রসার ও জ্ঞানের আদান-প্রদান ঘটানোই ছিল তার লক্ষ্য। বিশ্বজুড়ে নও-মুসলিমদের কীভাবে কুর'আন এবং ইসলামী নীতিগুলো শেখাতে হবে – সে বিষয়ে চিন্তার বহু খোরাক রেখে গেছেন তিনি। তিনি এমন এক নেযাম প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যা ইসলামের সাধুতা নিশ্চিত করতে সহায়ক হয়েছিল।

লেনদেনের ক্ষেত্রে হযরত উমর (রা.) সর্বদা মনে রাখতেন যে, একদিন আল্লাহ্‌র কাছে সব কাজের হিসাব দিতে হবে। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মুসলমান। আল্লাহ্ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন। আমীন। (শেষ)

References

1. *The Concise Encyclopaedia of Islam,* Cyril Glasse, Harper San Francisco, 1999.

2. *Life of Muhammad,* Mirza Bashiruddin Mahmood Ahmad, Islam International Publications Ltd, Tilford, UK, 1990.

3. *Islam – a short history,* Karen Armstrong, Phoenix Press, London 2001.

4. *The Preaching of Islam,* T. W. Arnold, Aryan Books International, New Delhi, 1998.

5. *Al-Quds,* Mohammed Abdul Hameed Al-Khateeb, Ta-Ha Publishers, London 1998.

6. *Intrigues against Khilafat-i-Rashida and their Impact,* Maulana Sheikh Mubarak Ahmad, Ascot Press, London.

7. *Khulafa-e-Rashideen,* Majeed A Mian, Review of Religions, Vol.92, No.3, March 1997.

8. *The Book of Character – writings on character and virtue from Islamic and other sources,* Camille Helminski, The Book Foundation, Bristol 2004.

9. *The History of the Khalifas who took the right way,* Jalaladdin as-Suyuti, Ta-Ha Publishers, London 2006.

10. *Nubuwwat & Khilafat – Prophethood and its successorship,* Islam International Publications Ltd, Tilford, UK, 2006.

11. *The Excellent Esemplar: Muhammad the Messenger of Allah,* Muhammad Zafrullah Khan, The Chaucer Press, UK, 1962.

12. *The Muqaddimah – an introduction to History,* Ibn Khaldun, Princeton University Press, New Jersey, USA, 2005.

13. *A short history of Islam,* Dr. S. E. Al-Djazairi, The Institute of Islamic History, Manchester, UK, 2006.

14. *The Decline and Fall of the Roman Empire,* Edward Gibbon, Volume 5, P.381, London, 1858.

15. *The Translation of the Meanings of Sahih al-Bukhari (vol. 1-9),* Dr Muhammad Muhsin Khan, Islamic University, Madinah, Saudi Arabia.

16. *Historical Atlas of the Islamic World,* David Nicolle, Mercury Books, London, 2004.

17. *History of Al-Tabari (Vol. VI-XIV).* Suny Series of Near Eastern Studies, State University of New York Press, USA.

ধর্মের সেবায় জীবন উৎসর্গ করুন

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ

وَلۡتَکُنۡ مِّنۡکُمۡ اُمَّۃٌ یَّدۡعُوۡنَ اِلَی الۡخَیۡرِ وَیَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَیَنۡہَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ ؕ وَاُولٰٓئِکَ ہُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿۱۰۵﴾

অনুবাদ : আর তোমাদের মাঝে এমন একদল (লোক) থাকা দরকার যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং এক সৎকাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে বারণ করবে। আর এরাই সফল হবে। (সূরা আলে ইমরান : ১০৫)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন :

আমার জামা'তকে উদ্দেশ্য করে ওসীয়্যত করা (জরুরী উপদেশ) এবং তাদের নিকট আমার এ কথা পৌঁছে দেয়া আমার অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি; অত:পর প্রত্যেকের অধিকার আছে, তারা এ কথা শোনে বা না শোনে। কেউ যদি মুক্তি (নাজাত) কামনা করে এবং পবিত্র জীবন, চিরস্থায়ী জীবন পেতে চায়, তবে সে যেন নিজ জীবন উৎসর্গ করে, সকল প্রকার চেষ্টা চালায়, চিন্তা-ভাবনা করতে থাকে যে, কিভাবে সে এ মর্যাদা লাভ করবে–যেন সে বলতে পারে, 'আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার সকল কুরবানী, আমার নামাযগুলো কেবল মাত্র আল্লাহ্রই জন্য।" (মলফুযাত, ১ম খন্ড, পৃ: ৩৭০)

কাদিয়ানে প্রতিষ্ঠিত তা'লীমুল ইসলাম হাই স্কুল সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন : এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মের সেবার জন্য মানুষ গড়ে তোলা। এটা আল্লাহ্র বিধান যে, প্রথমে যারা এসেছে তারা প্রথমে চলে যাবে, পরবর্তিতে যারা আসবে তারা পূর্ববর্তীদের উত্তরাধিকারী হবে। পরবর্তিতে যারা আসে তারা যদি পূর্ববর্তীদের উত্তরাধিকারী না হয় তবে জাতি ধ্বংশের দিকে যাত্রা আরম্ভ করে। মৌলভী আব্দুল করিম শিয়ালকোটি এবং অন্য যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের স্থলাভিষিক্ত কেউ হয়নি। অপরদিকে এই মাদ্রাসার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে, তাতে কি লাভ? যারা পাশ করে বের হচ্ছে ইহজাগতিক চিন্তায় লেগে যাচ্ছে। আসল উদ্দেশ্য অর্জন হচ্ছে না, আমি জানি যদি এ অবস্থার পরিবর্তন না হয় তাহলে কিছু হবে না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর এই বক্তব্যের ভিত্তিতে হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন ও (পরবর্তীতে খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল) অন্যান্য বুর্যুর্গগণের পরামর্শে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অনুমতি নিয়ে মাদ্রাসা আহমদীয়ার (পরবর্তীতে জামেয়া আহমদীয়া) ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছিলেন : এই মাদ্রাসা কাদিয়ান যদি প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে অনেক বরকতের (কল্যাণের) কারণ হবে। এর দ্বারা আধুনিক শিক্ষিত একটি বাহিনী আমাদের হাতে আসতে পারে।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতায়ন; রূহানী খাযায়েন ২০ খন্ড, ৭৫ পৃ:)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইন্তেকালের পরে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) প্রথম বয়আত গ্রহণের পূর্বেই বলেছিলেন : "মাদ্রাসা দীনিয়াত ধর্মীয় মাদ্রাসার শিক্ষিত প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা আমার ইচ্ছামত চালাতে হবে।" (বদর পত্রিকা, কাদিয়ান ২ জুন ১৯০৮)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন : মাদ্রাসা আহমদীয়া তোমাদের আমলী জেদ্দো জেহাদের (বাস্তবধর্ম সংগ্রামের) কেন্দ্রবিন্দু হবে। এর সাফল্যের উপর নির্ভর করবে যে ভবিষ্যতে জামা'তের তবলীগের প্রোগ্রাম চলতে থাকবে কি না।" আল ফযল, ১২ জুলাই ১৯২০ইং)

১৯২৮ইং সনে পূর্ণাঙ্গ জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠার উদ্বোধনী ভাষণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন : বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের এই সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন, এতে আমাদের গর্ব করা উচিৎ যে, তেরশ' বছর পরে উপরোক্ত আয়াতের আলোকে কার্যক্রম হাতে নিতে আমাদের সুযোগ ও শক্তি দিয়েছেন। আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত আহমদী জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার নির্দেশ ও হেদায়াতের অধীনে মাদ্রাসা আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যেন এখান থেকে এমন জনশক্তি তথা এমন একটি দল তৈয়ার হয় **যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভাল কথা শিক্ষা দিবে।** (সূরা আলে ইমরান : ১০৫) এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করবে।" (আল ফযল, ১৪ আগষ্ট ১৯২৮ইং, আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খন্ড, পৃ: ২১৩)

হুযূর (রা.) আরো বলেন : জামা'তের দাওয়াত ও তবলীগের জন্য এমন একটি দল তৈয়ার হবে যারা চিরদিন জামা'তের দাওয়াত ইলাল্লাহ্র কাজ চালিয়ে যাবার যোগ্যতা রাখবে।

হুযূর (রা.) আরো বলেন : আমি তাহরীক (জোরালো আবেদন) করতে চাই, রাজনৈতিকভাবে সম্মানিত জাতি বলে যাদেরকে মনে করা হয় তাদের লোকেরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের সন্তানদেরকে ধর্মের সেবার জন্য উৎসর্গ করে থাকেন........কাজের পরিধি যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা দেখে মনে হচ্ছে যে, প্রতি বছর একশ' জন নয় বরং দুইশ'জন ওয়াকফে যিন্দেগী মুরব্বী হয়ে বের হয়ে আসা উচিৎ।

অতএব, আমি জামা'তকে তাহরীক করছি যে, আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে জামেয়া আহমদীয়ায় প্রেরণ করবেন যেন তারা ধর্মের সেবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।" (আল ফযল, রাবওয়া ১৪ এপ্রিল, ২০১১ইং)

যারা ওয়াকফ (জীবন উৎসর্গ) করবেন তাদের উদ্দেশ্যে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন :

খোদা তাআলা আপনাদের জন্য বড় বড় সম্মান রেখেছেন। তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখ এবং আল্লাহ্র ধর্মের প্রচারের জন্য নিজেদের উৎসর্গ কর। তিনি যখন দেয়ার জন্য আসেন তখন তিনি এত কিছু দিয়ে দেন যে, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যায়।" (আল ফযল রাবওয়া, ১৪ এপ্রিল ২০১১ইং শেষ পৃষ্ঠা)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রহ.) বলেন : যাই হোক, জামেয়া আহমদীয়ার জন্য বিরাট অংকের টাকা খরচ হয়। ম্যাট্রিক পাশ ছাত্র ভর্তি করা হয়। তারপর পড়ানো হয়। যেমন প্রত্যেক তরতাজা জীবন্ত গাছের কিছু শাখা শুকে ঝরে পড়ে। অনুরূপভাবে যারা 'শাহেদ' ডিগ্রী লাভ করে তাদেরও কোন কোনটাকে কেটে ফেলা হয়। প্রতি বছর ছাঁটাই করতে হয়। ফল অনেক কম হয়–খরচ অনেক করতে হয়।

আমাদের টাকার উৎস অনেক কম ছিল এবং মুরব্বীগণ যাদের আমরা প্রস্তুত করেছিলাম এদের প্রত্যেকের জন্য বিপুল পরিমাণ খরচ করতে হয়েছে। কিন্তু তবুও প্রয়োজনের দিক থেকে বড় গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য এ খরচ অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে।" (খুতবাতে নাসের : ৪র্থ খন্ড, পৃ: ৪-৫)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) বলেন :

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের ছাত্রদের (জামেয়ার) বক্তৃতা প্রদান ও লেখনী শক্তির যোগ্যতাকে বৃদ্ধি করুন এবং তাদের বাহ্যিক ও রূহানী জ্ঞানে সমৃদ্ধ করুন। ভবিষ্যতে উত্তম কর্মিবাহিনী প্রমাণিত করুন। আমাদের পক্ষ থেকে ছাত্রও শিক্ষকবৃন্দকে অনেক অনেক মুহাব্বত ভরা সালাম।"

(জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ার প্রিন্সিপালের নামে চিঠি, তারিখ ৯ জুন, ১৯৯৮ইং জামেয়ার

মুয়েসীকা, খিলাফত জুবিলী সংখ্যা)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) কাদিয়ানের জামেয়ার শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে ১৩ জানুয়ারী ২০০৬ইং যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেখানে বলেছিলেন :

"ওয়াকফে যিন্দেগী মুরব্বীগণ কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব করেন না, যুগ খলীফার প্রতিনিধিত্ব করেন।'

(শতবার্ষিকী খিলাফত জুবিলী স্মরণীকা জামেয়া রাবওয়া পৃ: ৫১)

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) জামেয়ার প্রিন্সিপালের নামে লিখিত পত্রে নসীহত করে থাকেন। দোয়া করেন। যেমন ৫ এপ্রিল ২০১১ইং তারিখে লিখিত পত্রে হুযূর (আই.) লিখেছেন :

"আল্লাহ্ তাআলা আপনাকে এবং সকল শিক্ষকবৃন্দকে নিজ নিজ কর্তব্যসমূহ উত্তমরূপে পালনের তৌফিক দান করুন এবং নিজ ফযল নাযেল করুন।"

১৮ এপ্রিল ২০১১ইং তারিখে লিখিত পত্রে হুযূর (আই.) লিখেছেন :

আল্লাহ্ তাআলা জামেয়ার ছাত্রদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দান করুন, নিজ কৃপা বর্ষণ করুন। আল্লাহ্ তাআলা আপনার সাথী হোন এবং আপনাকে উত্তমভাবে কর্তব্যসমূহ পালনের তৌফিক দান করুন, (আমীন)।

অনুরূপভাবে হুযূর (আই.) সব সময় আমাদের জন্য বিশেষ দোয়া করেন। সব সময় হুযূর (আই.) জামেয়ার সকল দিক দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে থাকেন। আমাদের সকলের বিশ্বাস হযরত খলীফাতুল মসীহ্ (আই.) হামেশা মুরুব্বী মোয়াল্লেম অর্থাৎ যারা জীবন উৎসর্গ করে রেখেছেন তাদের জন্য এবং যারা জামা'তের কাজে সময় দেন তাদের জন্য বিশেষ দোয়া করেন।

আল্লাহ্ তাআলা আমাদের হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-কে সুস্বাস্থ্য ও খাস হেফাযতে রাখুন-দীর্ঘজীবি করুন। আমাদের তরফ থেকে হুযূর হামেশা সুসংবাদ লাভ করুন। আমীন।

জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশে ভর্তির জন্য স্বাস্থ্যবান, চরিত্রবান, বুদ্ধিমান, ন্যায়পরায়ণ, নিষ্ঠাবান, ছাত্রের প্রয়োজন। বিশেষ করে যারা ওয়াকফে নও-এর অন্তর্ভুক্ত আছেন তারা এগিয়ে আসুন। আল্লাহ্ তাআলা আপনার হেদায়াত দিন।

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ-এ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশে ৭ বছর মেয়াদী শাহেদ কোর্সে ৬ষ্ঠ ব্যাচে ভর্তিচ্ছুদের নিকট থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে। আগামী ০৪ জুন ২০১১ এর মধ্যে দরখাস্ত সেক্রেটারী বোর্ড অব গভর্ণরস জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ। ৪নং বকশী বাজার বরাবর পৌঁছতে হবে। আগামী ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭ জুন ২০১১ তারিখ ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ইনশাআল্লাহ্। আবেদনকারী ছাত্রদেরকে অবশ্যই ১৪ জুন ২০১১ তারিখ বিকাল ৫-০০টার পূর্বে জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশের অফিসে পৌঁছে রিপোর্ট করতে হবে।

আবেদনকারীর যোগ্যতা নিম্নরূপ হবে ঃ

১. এস. এস. সি/এইচ. এস. সি-তে উত্তীর্ণ হতে হবে এবং গড়ে নূন্যতম "বি" গ্রেড থাকতে হবে।

২. এ বছর এইচ. এস. সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে এস. এস. সি -তে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে।

৩. ভালো স্বাস্থ্য ও মেডিকেল চেকআপে উত্তীর্ণ হতে হবে।

৪. সর্বোচ্চ বয়স সীমা, এস. এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৭ এবং এইচ. এস. সি উত্তীর্ণদের জন্য ১৯ বছর।

৫. ওয়াকফে নও ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে অগ্রাধিকার পাবে।

৬. কুরআন শুদ্ধভাবে পড়া অবশ্যই জানতে হবে, ধর্মীয় সাধারণ জ্ঞানে ভাল হতে হবে এবং জামাতি বই পড়ার অভ্যাস থাকতে হবে।

৭. জীবন উৎসর্গকারী হতে হবে।

৮. ভাল আহমদী তাকওয়াশীল এবং জামাতি কাজে অংশগ্রহণকারী হতে হবে।

৯. আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাল জানা থাকলে অগ্রাধিকার পাবে।

১০. বয়আত গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিন বৎসর অতিক্রান্ত হতে হবে।

১১. ভর্তির জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা ও এপ্টিচিউড টেষ্টে ভাল ফলাফল করতে হবে।

১২. আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাবলী অবশ্যই থাকতে হবে-অন্যথায় আবেদন পত্র গ্রহণ যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। আবেদনকারীর সঠিক ঠিকানা এবং বাড়ির অথবা জামাতের ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

(ক) নিজের নাম (খ) পিতার নাম (গ) মাতার নাম (ঘ) জন্ম তারিখ এবং বয়আতকারী হলে বয়আতের তারিখ (ঙ) শিক্ষাগত যোগ্যতা (চ) স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্র হতে হবে (ছ) স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্টের সুপারিশ থাকতে হবে (জ) জামাতি মজলিসি চাঁদা পরিশোধ মর্মে স্থানীয় সেক্রেটারী মাল/নায়েম মাল এর সার্টিফিকেট থাকতে হবে (ঝ) ওয়াকফে নও হলে নম্বর উল্লেখ করতে হবে (ঞ) অন্য কোন বিশেষ যোগ্যতা থাকলে উল্লেখ করতে পারেন (ট) জামাতের এমন দুইজন বিশেষ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করতে হবে যিনি আপনার সম্বন্ধে ভাল করে জানেন (ঠ) জামাতের কোন বুযুর্গ (মৃত বা জীবত) এর সাথে যদি আত্মীয়তার সম্পর্ক থেকে থাকে তবে তা উল্লেখ করুন।

বি: দ্রঃ প্রত্যেক স্থানীয় জামাতে জুমুআর নামাযে একাধিক দিন সার্কুলারটি এলান এবং নোটিস বোর্ডে প্রদর্শনের অনুরোধ করছি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করার মোবাইল নাম্বার ০১১৯১৩৬৩৪১৮ অথবা ০১৯২২০২৪৫৯১।

সেক্রেটারী
বোর্ড অভ গভর্ণরস
জামেয়া আহমদীয়া, বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ বাংলাদেশ

শ্রীকৃষ্ণ ও যীশু খৃষ্ট

অনুবাদঃ মোহাম্মদ ফজলুর রহমান

[১৯৯৬ সনের ১৩ জানুয়ারী তারিখে যুক্তরাজ্যের লীসেষ্টারে আহমদীয়া জামা'তের একটি নতুন কেন্দ্র উদ্বোধন উপলক্ষে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ৪র্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) বিভিন্ন ধর্মমতের প্রতিনিধি বৃন্দের এক বড় সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দান করেন। তিনি সেখানে তাঁর সমীপে উত্থাপিত প্রশ্নাদির জ্ঞানগর্ভ জবাব দান করেন। উক্ত অধিবেশনে উত্থাপিত দু'টি প্রশ্ন ও হযরত মির্যা তাহের (রাহে.) প্রদত্ত জবাবের অনুবাদ উপস্থাপন করা হলো]

কৃষ্ণ- 'আমিই শুরু এবং আমিই শেষ'

প্রশ্নকর্তা : আমার প্রশ্ন হচ্ছে প্রভু কৃষ্ণ (আ.) সম্পর্কে। আমরা হিন্দু প্রভু কৃষ্ণ-কে সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং নিধনকর্তা জ্ঞান করি। যেভাবে তিনি স্বয়ং বলেছেন. 'সকল সৃষ্টির মাঝে আমিই শুরু, আমিই শেষ আর আমিই মাধ্যম। আমি অজাত এবং অনাদি যদিও আমি সচেতন সত্তার প্রভু, তথাপি আমি প্রত্যেক সহস্রাব্দে আমার মৌলিক অতিপ্রাকৃত রূপে প্রকাশিত হই'। আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামী দর্শনের সাথে এই ধর্মীয় দর্শন কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ?

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ঃ সর্বপ্রথম আমি আপনার উপর্যুক্ত ছত্রসমূহের ব্যাখ্যার সাথে দ্বিমত পোষণ করি। তুলনামূলক ধর্মীয় বিষয়ের আমি একজন ছাত্র ছিলাম। আমি দেখেছি যে, প্রত্যেক ধর্ম, সেটা আজ আমাদের কাছে যতই পৌত্তলিক বলে বিবেচিত হোক, মূলতঃ একেশ্বরবাদী ধর্ম ছিল, কারণ, যদি কেউ এই বিশ্বজনীন নীতি গ্রহণ না করে, তাহলে ধর্মসমূহের মধ্যে বিদ্যমান যুক্তিতর্কসমূহ বিরতিহীন হয়ে পড়বে এবং এটা প্রতীয়মান হবে যে, প্রত্যেক ধর্মই ভিন্ন ভিন্ন উৎস ও পৃথক পৃথক খোদা থেকে উ দ্ভুত হয়েছে।

এখন, বেদ এর শিক্ষার বিপরীতে যা আমাদের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে, এর পাশাপাশি আপনাদের এও স্মরণ রাখা দরকার যে, এটা হুবহু সেই কথা, যেভাবে যীশু খৃষ্ট (আ.) বলেছেন যে, আমিই সূচনা, আমিই সমাপ্তি এবং কেবল যীশু খৃষ্ট (আ.)ই এ কথা বলেন নি, পবিত্র কুরআনেও এ সত্যের উল্লেখ রয়েছে যে, পবিত্র নবী (সা.) হচ্ছেন সেই উৎস ও উপায়, যা দ্বারা মানুষ খোদাতে পৌঁছতে পারে এবং যখন তাঁকে খাতামান নবীঈন' (অর্থাৎ সব নবীর মোহর), বলা হয়, তখন এতে সমাপ্তি বুঝায়। কিন্তু অন্য এক হাদীসে [পবিত্র নবী (সা.)-এর পরম্পরা গত মতবাদ] তিনি নিজেকে যথার্থ প্রথম ও সূচনা বলে দাবী করেন এবং মুসলমানদের সব সম্প্রদায়ের সম্মিলিত মতানুযায়ী কুরআনের কয়েকটি আয়াতের ঘোষণা মতে তাঁর জন্মই ছিল সর্বাগ্রে।

এখন, এখানে প্রশ্ন হলো, আপনার অথবা অন্য কারো কৃত অনুবাদ, যা এ ইঙ্গিত বহন করে যে, কৃষ্ণ (আ.) দাবী করেছিলেন, তিনি কখনো জন্মগ্রহণ করেননি, অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন চিরন্তন। আমি নিজে গভীর মনযোগ সহকারে ভগবৎ গীতা অধ্যয়ন করেছি এবং আমি খোদার সত্যতা ও একত্বের একমাত্র সাক্ষ্য আবিষ্কার করেছি, এবং কৃষ্ণ (আ.) নিজেই শুধু মাত্র একজন 'প্রেরিত' হবার দাবী ভিন্ন অন্য কোন দাবী করেন নি। উদাহরণস্বরূপ, তাঁর 'মুরালি ধর' (বাঁশি বাদক) বলে আখ্যায়িত হওয়া। আপাত দৃষ্টিতে বাঁশীতে বাদ্য-বাজনা বা সঙ্গীত সৃষ্টি হলেও নেপথ্যে কেউ এতে ফুঁ দিয়ে থাকেন। তাহলে সাধারণ মানুষের চাইতে তার অধিক ক্ষমতা এবং একটি সুনির্ধারিত শরীরও আছে, কিন্তু দুই হাতের স্থলে তার চারটি হাত এবং এও জানা যায় যে, তার ডানাও রয়েছে। এখন এসব প্রতীক, অথবা ওগুলো যদি প্রতীক না হয়, তবে ওগুলোর আক্ষরিক অর্থ কী নির্দেশ করে? আপনি যেভাবে বলেছেন, তিনি আমাদেরকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, প্রত্যেক সহস্রাব্দে 'আমি আমার আসল রূপে পুণরাবির্ভূত হবো'। এটাই কি তাহলে খোদার আসল রূপ? চার বাহু বিশিষ্ট কোন মানুষের আকৃতির এটা কি কোন জায়গা, যেখানে তাকে সীমাবদ্ধ করার পর কোথাও অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করবে। খোদার সৃষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে এটা এক অতীব সীমাবদ্ধ ধারণা। শ্রীকৃষ্ণ (আ.) কিভাবে ওকথা বলতে পারেন? তাঁর বার্তাকে ভুল বুঝা অথবা তাঁর কথার ভুল অর্থ করা হয়ে থাকতে পারে। নির্ধারিত ধর্মীয় পরিভাষার কারণে এধরণের ভুল বুঝাবুঝি প্রত্যেক ধর্মেই দৃষ্টিগোচার হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, 'ডানাসমূহ' শব্দটির ব্যবহারটিই ধরা যাক। ফেরেশ্‌তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে 'ডানাসমূহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে একথা স্পষ্ট করেছে যে, এগুলো সেই ডানা নয়, যাদ্বারা ওড়া হয়, বরং এগুলো হচ্ছে গুণাবলীর নির্দেশক। সুতরাং 'দু'টি বাহু' দ্বারা চার বাহু সম্পন্ন লোকের আয়ত্বাধীন গুণাবলীর অর্ধেকটি বুঝায়। ফেরেশতারা গুণ নিয়ে এ জগতেও জন্মে থাকে এবং পবিত্র কুরআন মোতাবেক তাদের চারটি করে ডানা আছে। কিন্তু পরকালে তাদের আটটি 'ডানা' থাকবে আর আমরা বলবো, এসব শব্দ ও সংখ্যার সবগুলোই হচ্ছে রূপক। উদাহরণস্বরূপ, খোদা পবিত্র নবী (সা.)-কেই বিশ্বাসীদের উপর তাঁর 'ডানা' নিচু করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তারপর লোকদের বলা হয়েছে তাদের পিতা-মাতাদের উপর তাদের 'ডানা' নিচু রাখতে। সুতরাং কুরআনের অন্যান্য স্থানেও একই 'ডানা' শব্দের এসব প্রয়োগ থেকে আমাদের কাছে এটা পরিষ্কার যে, ওগুলো কেবলই পরিভাষা, সেগুলোকে ভুল বুঝা হয়েছে এবং সেগুলোকে ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

সংক্ষেপে, আহমদীয়া বিশ্বাস মতে, হযরত তিনি কৃষ্ণ (আ.) আল্লাহর একজন পবিত্র রাসূল ছিলেন। সে সময়ের জগতকে সত্য সমূহ পৌঁছানোর জন্য তিনি একটি প্রতীকের ভাষা ব্যবহার করেছিলেন এবং আপনি যদি ভগবত গীতা বিস্তারিতভাবে পাঠ করেন, তাহলে দেখবেন যে, এটি শুধু দু'টি দলের মধ্যে যুদ্ধের বর্ণনাই নয়। আসলে এটা মন্দের বিরুদ্ধে ভালোর অথবা ভালোর বিরুদ্ধে মন্দের লড়াইয়ের বর্ণনা সম্বলিত একটি সেরা গ্রন্থ। এ যুদ্ধ আঁধার ও আলোর যুদ্ধ।

এখন জরাথুস্ত্রবাদের দিকে ফেরা যাক,

জরাথুস্ত্র যা বলেন, তা সেই একই কথা, যার পরিভাষা ভিন্ন। তিনি অন্ধকারের বিরুদ্ধে আগুনের কথা বলেন, এবং আগুন সত্যের প্রতীক, যিনি হচ্ছেন খোদা, আর অন্ধকার মিথ্যার প্রতীক, যে হোল শয়তান। বাইবেল এবং পবিত্র কুরআনেও একই রকম প্রতীকি-বক্তব্য দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে ওগুলো একথা বুঝায় না যে, মন্দের নিজস্ব এবং স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব ছিল এবং এমন এক খোদা থেকে উদ্ভূত, যিনি ভগবান থেকে স্বাধীন এক খোদা।

সুতরাং এগুলো হচ্ছে প্রতীকি শব্দ এবং পরিভাষাগত একই ধরণের শব্দের ব্যবহার প্রত্যেক ধর্মেই লক্ষ্য করা যায়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এগুলো দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে একটি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিচক্ষনতাপূর্ণ পারস্পরিক বোঝাপড়ায় আসা, যা দ্বারা আমরা বিশ্বের ধর্মসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সেরূপেই গ্রহণ করতে পারি, যেরূপে এটা একমাত্র উৎস অর্থাৎ খোদা থেকে উদ্ভুত হয়েছিল।

যেহেতু এ বিষয়ে অধিক বিতর্কে যাওয়া লাভ জনক হবে বলে আমরা মনে হয় না, তাই আমি আশা করি, এটুকুই পর্যাপ্ত হবে।

যীশু-'আমিই উপায়, আমিই সত্য এবং আমিই আলো'

প্রশ্নকর্তা ঃ আমি বেসরকারী ক্যাথলিক গীর্জায় কর্মরত। যীশু (আ.) ক্রুশে মৃত্যুবরণ করার সময় বলেছেন, 'হে পিতা, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো, কারণ তারা জানেনা, তারা কী করে'। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যীশু (আ.) বলেছিলেন, আমিই উপায়, আমিই সত্য এবং আমিই আলো–আমার মাধ্যম ছাড়া কেউ পিতার কাছে আসতে পারে না'। এ বিষয়ে অনুগ্রহ করে আনপার মন্তব্য ব্যক্ত করুন।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) –আমাদের হিন্দু বন্ধুর উত্থাপিত পশ্নের জবাবে ইতোমধ্যে আমি এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছি যখন তিনি যীশু (আ.)-এর বহু আগে আগত কৃষ্ণ (আ.)-এর একই দাবীর কথা উল্লেখ করছিলেন। স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমি সব বড় বড় ধর্মের মৌলিক গ্রন্থাদি পাঠ করেছি যার মধ্যে সব নবী অথবা ধর্মীয় গ্রন্থাদির বক্তব্যে হুবহু একই উদ্ধৃতি দেখতে পাওয়া যায়। পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-ও ঠিক একই দাবী পেশ করেছেন। সুতরাং আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, এটা সময়-সম্পর্কিত একটি দাবী। প্রত্যেক নবীকেই এ দাবী করতে হবে, কারণ, যদি একজন নবী বলেন 'আমি উপায় নই', তাহলে তিনি নিজেকে অস্বীকার করছেন। তিনি তাঁর মাধ্যমে মানুষের খোদা-দর্শনের অপরিহার্যতাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। অতএব, ইসলামী পরিভাষায় পবিত্র কুরআনে পবিত্র নবী মুহাম্মদ (সা.)-কে 'ওয়াসীলা' অর্থাৎ খোদা প্রাপ্তির 'প্রবেশ পথ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে কথা আমি বহুবার পাঠ করেছি। বাইবেল পাঠ করতেও আমি ভালোবাসি কিন্তু যেহেতু আমি অন্যান্য ধর্মও অধ্যয়ন করেছি (এবং তাদের বই পাঠ করেছি), আমি অবধারিতভাবেই সেগুলোর মধ্যে বিদ্যমান প্রকাশ ভঙ্গির অনুরূপতা দেখতে পাই।

কিন্তু এদ্বারা কেবল এটাই বুঝায় যে, খোদা সম্পর্কে একজন নবী নিজেই এক চিরন্তন সত্যে পরিণত হন, কারণ তিনি যদি কেবলই খোদার ভাষায় কথা বলেন, তাহলে তিন নিজেও তাঁর দর্শন ও চিন্তাধারায় চিরন্তন হয়ে যান, ব্যক্তিত্বে অথবা তাঁর মানবীয় গঠনে নয়। সুতরাং যদি কোন লোক চিরন্তন খোদার অধিকারভুক্ত হন, তাহলে তাঁর মধ্যে অবশ্যই সেই চিরন্তন খোদার কিছু বৈশিষ্ট থাকবে অথবা খোদার চরিত্রের কিছু দৃশ্য তাঁর নিজের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে, অন্যথায় খোদার সাথে তাঁর যোগাযোগ অথবা খোদার অধিকারভুক্ত হবার তাঁর যে দাবী, তা মিথ্যা সাব্যস্ত হবে, যদি তিনি কোন নিদর্শন দেখাতে না পারেন। সুতরাং এসব হচ্ছে মৌলিক লক্ষণ, যা দ্বারা বিশ্বের সব বড় নবীগণ চিরন্তন সর্বোচ্চ সত্তার সাথে নিজেদের সম্পর্কিত হবার প্রমাণ স্বরপ দেখিয়ে থাকেন এবং তাদের মধ্যে আপনি 'সূচনা' 'সমাপ্তি' এবং 'দরজা' দেখতে পান। আশা করি বিষয়টির উপর এই আলোচনা আপনাদেরকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বুঝাতে যথেষ্ট হবে।

তথ্যসূত্র ঃ রিভিউ অব রিলিজিওনস, অক্টোবর, ১৯৯৬

শোক সংবাদ

* গত ০৯/০৪/২০১১ রোজ শনিবার সকাল সাড়ে ১১টায় আহমদনগর নিবাসী আমার পিতা জনাব রমিজ উদ্দীন আফ্রাদ ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল প্রায় ৮০ বছর।

মরহুম ৩ মেয়ে, ২ ছেলে, ১০ জন নাতিনাতনী এবং অসংখ্য আত্মীয় স্বজন রেখে যান। মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত এবং জান্নাতের উচ্চ মোকাম লাভের জন্য জামা'তের সকলের কাছে বিনীত দোয়ার অনুরোধ করছি।

শরীফ আহমদ আফ্রাদ, মোবাশ্বের মুরব্বী

* শালশিড়ি জামা'তের মক্তব শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ আলী গত ০৩/০৩/২০১১ ভোর ৫টায় পঞ্চগড় রৌসন ক্লিনিকে মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

তিনি ওসীয়্যতের জন্য আবেদন করায় মিছাল নম্বর পেয়েছিলেন। তাঁর মিছাল নম্বর ১০৪১৩৮। মহান আল্লাহ্ তাআলা যাতে তাঁকে বেহেশ্‌তের উচ্চ মাকাম দান করেন এবং তাঁর রেখে যাওয়া স্ত্রী, পুত্র কন্যাদের সাবরে জামীল দান করেন সেজন্য দোয়া প্রার্থনা করছি।

মোহাম্মদ তাজউদ্দীন

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার জন্য একজন অভিজ্ঞ গাড়ী চালক জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন।

স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট/আমীরের প্রত্যয়নসহ আগ্রহী প্রার্থীদের স্বহস্তে লিখিত আবেদন পত্র আগামী ২০ মে ২০১১-এর মধ্যে আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার বরাবর জমা দেয়ার জন্য আহ্বান করা যাচ্ছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

জেনারেল সেক্রেটারী
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা

নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামি শিক্ষা

মওলানা বশিরুর রহমান, মুরুব্বী সিলসিলাহ

(৩য় কিস্তি)

অপচয় রোধ করার মাঝে জাতীয় পর্যায়ে উপকার বা লাভ তো আছেই, তদুপরি মৌলিক নীতিগত ভাবে মানুষ উক্ত বিষয়গুলোর দিকে মনোযোগ দেয়ার ফলশ্রুতিতে তার নিজের চরিত্র গঠনেও সহায়ক হবে। এতে বাচ্চাদের তরবীয়তের ক্ষেত্রে অনেক উপকার হতে পারে। বিদ্যুতের ব্যাপারে লক্ষ্য করে দেখুন। মানুষ বিনা কারণে গৃহে আলো জ্বেলে রেখে যায়। রেডিও বা টিভি চালু রেখে চলে যায়। মানুষের পক্ষে তো শোভনীয় নয় যে এরূপ অযথা খোদা তাআলার এই নেয়ামতগুলিকে নষ্ট বা অপচয় করে। কিন্তু ধৈর্যের সাথে তরবীয়ত করতে হবে, বার বার এমনটি হতে দেখেছি বদতমীজি বা রূঢ়তার সাথে নয়। এই যে দুটি বিষয় এ দুটোই সমান্তরালে চলে, অর্থাৎ সংযম সহনশীলতার শিক্ষা এবং ক্ষতি থেকে বাঁচার প্রবণতা, কোন রকমে জাতীয় ক্ষতি যেন সাধিত না হয়। এর ফলে নিজেদের এবং পরিবারের উপকার হবে, আর বাচ্চারা বড় হতে হতে এর বহুবিধ সুফল লাভ করবে। ঐ সব লোক যাদের ছোট ছোট ক্ষতির ব্যাপারে কোন পরওয়া বা দ্বিধা থাকে না, তারা যখন ব্যবসা বাণিজ্য করে, তখন তারা নিজেদের দিক থেকে সাহস সহনশীলতা প্রদর্শন করতে থাকে এবং বলে যে "এমনটি ঘটে গেছে? যাক গে, তাতে কিছু যায় আসে না। ও হো! অমুক ক্ষতি হয়েছে, ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমরা সামনে আরো উপার্জন করে নেব। এ সবই অজ্ঞতার কথা। ভাল ব্যবসায়ী তারাই হয়ে থাকেন যারা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ক্ষতিকেও সামান্য মনে করেন না। বস্তুত: সাহস সহণশীলতার অর্থ আদৌ এ নয় যে, নিজের ক্ষতি নিজের চোখের সামনে হতে দেখেও তা রোধ করার চেষ্টা না করা।

৫। গরীবের প্রতি সহানভূতিশীলতাঃ

পঞ্চম বিষয়টি হচ্ছে, গরীবের প্রতি সহানুভূতিশীলতা এবং তাদের দু:খ কষ্ট মোচনের সু-অভ্যাস। এটিও শৈশবকাল থেকেই সৃষ্টি করতে হয়। যে সব বাচ্চাদেরকে নম্রস্বভাব মায়েরা গরীবের প্রতি সহানভূতিশীলতার কথা শোনান, গরীবদের প্রতি সহানুভূতির প্রবণতা বাচ্চাদের স্বভাব চরিত্রে সঞ্চার করেন, তারা খোদা তাআলার ফযলে ও করমে ভবিষ্যতের জন্য "খায়রা উম্মত" হবার উপযোগী এক মহান জাতি উদ্ভাবনের আয়োজন করে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে যে সব মা স্বার্থপরতাসুলভ আচরণ বা ভূমিকা রাখেন এবং নিজেদের বাচাদেরকে শুধু তাদের নিজেদের দু:খ কষ্টের জন্য সংবেদনশীল করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট, তারা একটা আত্মকেন্দ্রিক ও স্বার্থপর জাতির জন্ম দেন। তারা পরিশেষে মানুষের জন্য মুসিবত হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই মানবীয় সহানুভূতি সৃষ্টি করা কেবল অপরিহার্যই নয় বরং এর মাধ্যমে নিজেদের সেই মহান উদ্দেশ্যটিকেও অর্জন হয় যার জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। কুরআন করীম বলেঃ

'তোমরা উৎকৃষ্ট উম্মত, যাদেরকে মানব জাতির সার্বিক উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে।' কাজেই আমরা যদি শৈশবকাল থেকেই নিজেদের সন্তানদেরকে মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীলতার ব্যাপারে মনোযোগী করে গড়ে না তুলি বা কার্যতঃ তাদের দ্বারা ঐ রূপ সহানুভূতির কাজ গ্রহণ না করি, অথবা তাদেরকে ঐরূপ কাজের শিক্ষা না দেই, যার ফলে গরীবের প্রতি তাদের অন্তরে সহানুভূতি প্রোথিত হয়, তা হলে এটা হবে এক মহা ভুল। আমাদের দেখা উচিৎ আমাদের বাচ্চারা সহানুভূতির আবেগ যেন বাল্যকাল থেকেই উপভোগ করতে শুরু করে। যতক্ষণ পর্যন্ত নেকীর স্বাদ অনুভব না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত নেকী স্থিতিশীলতা লাভ করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত এসব কেবল উপদেশ বাণী বৈ আর কোন মূল্য রাখে না। সে জন্য এর দুটি দিক আছে। প্রথমত: সন্তানদেরকে ভাল ভাল গল্প শুনিয়ে, শিক্ষা মূলক উপদেশ দান করে অথবা শিক্ষামূলক ঘটনাবলী বর্ণনা করে গরীবের প্রতি সহানুভূতির বিষয়ে আকৃষ্ট করুন, দু:খ মোচনের ব্যাপারে আগ্রাহান্বিত করে তুলুন, এরূপ অনুভূতি জাগিয়ে তুলুন যে, প্রতিটি ব্যক্তি যে বিপদ গ্রস্থ, দু:খ-কষ্টে নিপতিত তার বিপদ দূর হওয়া চাই। এবং তার দুঃখ-কষ্ট মোচনে সচেষ্ট হওয়া উচিত। খেদমতের প্রেরণা তাদের মধ্যে সৃষ্টি করুন বরং সেই সাথে যথোপযোগী উপলক্ষ্য এবং ক্ষেত্র তাদের সামনে তুলে ধরুন। আমাদের দেশে অর্থাৎ গরীব দেশগুলিতে বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তো ধনীরা এবং গরীবরা পাশা পাশিই রয়েছে। প্রতিদিন তাদের পথে ঘাটে, হাটে গঞ্জে দরিদ্রকে দু:খ কষ্টে মুহ্যমান দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বাচ্চাদেরকে বাল্যকাল থেকেই মানুষের দু:খ মোচনের অভ্যাস করানো সহজ। তবে দু:খ মোচনের কাজটি একদিকে কঠিনও বটে। কেন না গরীবদের দু:খ-কষ্ট এখানে এত বেশী যে সহানুভূতিশীল মানুষের সামর্থের সীমার অনেক উর্ধ্বে বলেই প্রতীয়মান হয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অভাব অনটন পূরণ করা যেহেতু আমাদের সামর্থের বাইরে সেজন্য আমরা অভাব মোচনের চেষ্টাই ছেড়ে দিব। এর অর্থ এই যে, মানুষ সাধ্যমত অপরের কষ্ট দূর করবে। তবে মন যেন এটাই চায় প্রত্যেকের কষ্ট দূর করতে পারি। বাল্যকাল থেকে যদি এর অভ্যাস গড়ে উঠে তা হলে এর ফলশ্রুতিতে বাচ্চারা যে স্বাদ অনুভব করবে তা এই নেকীকে স্থিতিশীলতা দান করবে।

৬। দৃঢ় সংকল্প ও সাহসিকতা

ষষ্ঠ বিষয় হচ্ছে, দৃঢ় সংকল্প, সাহসিকতা, ও বীরত্বের সাথে নম্রতা ও দয়াশীলতা একত্রে থাকা উচিত। এ দু'টি গুণ কারো মধ্যে যদি একত্রে না থাকে তাহলে ঐ মানুষটি দুর্বল তো হবেই, চরিত্রবানও হবে না। সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বকর (রা.) এই হিসাবে ইতিহাসে চিরকালের জন্য এক পূর্ণাঙ্গীন নমুনা বা দৃষ্টান্ত। যদিও তিনি হযরত আকদাস মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম থেকেই এই স্বভাব লাভ করেছিলেন, তবুও তাঁর জীবনে এমন একটি পর্যায় এসেছিল যখন ঐ চারিত্রিক গুণটি প্রকট ও সুস্পষ্ট হয়ে এক মহান ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলশ্রুতিতে, চিরকালের জন্য আমরা তাঁর দৃষ্টান্ত দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করতে পারি। অত্যধিক নম্রস্বভাব ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যখন তার খিলাফত কালের প্রথমদিনই ইসলামের উপর মুসিবত নেমে আসে, বিপদের ঘূর্ণিঝড় প্রবাহিত হয় এবং কঠিন সংকটাবলীর যুগ শুরু হয়, তখন সেই ব্যক্তিটি যিনি দুনিয়ার দৃষ্টিতে এতো কোমল হৃদয় ও নরম স্বভাবের ছিলেন যে সামান্য একটু দু:খের কথাতেই চোখ দিয়ে অশ্রু বেয়ে পড়তো, কারো এতটুকু কষ্টও যিনি

বরদাশত করতে পারতেন না, তিনি এরূপ বিস্ময়াতীত দৃঢ় সংকল্পের সাথে ঐ বিপদ ও সংকটের মোকাবেলায় দন্ডায়মান হয়ে গেলেন, যেমন প্রবল বন্যার সামনে কোন সুবিশাল ও সুদৃঢ় পর্বত মালা দন্ডায়মান হয়, যার বিন্দুমাত্র সরে যাওয়ার প্রশ্ন উঠে না। তেমনিভাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সেই সময় তার দয়ার্দ্র হৃদয় থেকে নির্গত মাহত্ম্যের এক পাহাড় দুনিয়াকে দেখালেন। অতএব কোমল হৃদয় ও নম্র স্বভাবের অর্থ আদৌ এই নয় যে, এরূপ মানুষ সংকটকালে দুর্বল হয়ে পড়ে, অথবা ক্রমবর্ধমান বিপদাবলীর সম্মুখে সাহস হারিয়ে বসে। বস্তুতঃ বাল্যকাল থেকে এ নৈতিক গুণটির বিকাশ ঘটানো উচিৎ যাতে আমরা কখনও পরাজয় বরণ করবো না, করতে পারি না। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি বাণী আছে যা এই মহান নৈতিক গুণটির উপর আলোকপাত করেঃ

"আমার প্রকৃতিতে ব্যর্থতার উপাদান নেই।" হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহান চরিত্রের উপর আলোকপাত কারী এটি এক অতি প্রিয় বাক্য। তাঁর স্বভাবের মধ্যে ব্যর্থতার কোন আমেজ নেই, মিশ্রণ নেই। এটা কতবড় শিক্ষকের শক্তি সঞ্চারী বাণী। এতে শক্তিশালী শিক্ষা রয়েছে। অতএব যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত, তাদের স্বভাবের মাঝেও কখনও পরাজয়ের মিশ্রণ থাকা উচিত নয়। বস্তুত: এইরূপ দৃঢ়সংকল্প ও সাহসিকতা শৈশব ও বাল্যকাল থেকেই যদি সৃষ্টি করা হয় তা হলে, এ সব চারিত্রিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটানো সম্ভব। যারা ছোট ছোট ব্যাপারে সাহস হারিয়ে ফেলে যেমন, পরীক্ষায় যদি ফেল করে তা হলে জীবনের প্রতি নিরাশা হয়ে পড়ে, জীবনের কোন কামনা বাসনা যদি পূর্ণ না হয় তা হলে যাদের সমগ্র জীবন দর্শন আমুল আলোড়িত হয়ে উঠে, তারা চিন্তা করে, কে জানে খোদাও আছেন কি না। তাদের স্বল্প পরিসর ক্ষুদ্র জগৎ যেন খড়কুটার দ্বারা তৈরী এবং তা সামান্য আলোড়নেই ধুলিস্যাৎ ও ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়। কাজেই যে জাতিকে জগতে অনেক বড় বড় কাজ সমাধা করতে হবে; মহান লক্ষ্যসমূহ ও উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করতে এবং বিরাট দায়িত্বাবলী সম্পাদন করতে হবে; যাদের সংকটাবলীর যুগ কয়েকটি বছরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয়, বরং কয়েক শতাব্দী ব্যাপী বিস্তৃত, তাদেরকে প্রতিটি সংকট অতিক্রম করতে হবে প্রতিটি বিপদকে বীরত্বের সাথে অকুতোভয়ে মোকাবেলা করতে হবে। প্রতিদিন শক্তিশালী শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে এবং তাদেরকে ব্যর্থ ও পরাভূত করে দিতে হবে। সেরূপ জাতির সন্তানেরা যদি বাল্যকাল থেকেই দৃঢ় সংকল্পের শিক্ষা না পায়; তা হলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এই মহান কর্তব্য সম্পাদন করতে পারবে না। সেজন্য নম্র মিষ্টভাষী সন্তান গড়ে তুলতে, নম্রস্বভাব ও দয়ার্দ্রসন্তান তৈরী করার চেষ্টা করতে হবে, যারা অন্যের সামান্যতম দু:খ-কষ্টে সংবেদনশীল, উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠবে, যাদের অন্তরে অপরের মর্ম বেদনায় ব্যথিত ও বিগলিত হতে শুরু করবে। অপর দিকে সন্তানদেরকে যেন দৃঢ়সংকল্পের অবিচল পাহাড়ে পরিণত করেন, যেন বীরত্ব ও সাহসিকতার এরূপ মহান দৃষ্টান্ত পরিনত করেন যাতে জাতিবর্গ তাদের কাছ থেকে মহান শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

নৈতিকতা গঠনের গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষা হল, আঁ হযরত (সা.) নিজ উম্মতকে বিশেষভাবে যে তিনটি বিষয় সম্পর্কে সতর্ক করেছেন, সেগুলো থেকে বেচে চলাতে সচেষ্ট হওয়া। তিনি (সা.) বলেছেন,

" আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় গুনাহ্ সম্বন্ধে অবহিত করব না?" তিনি এ কথা তিনবার পুণরাবৃত্তি করলেন। সাহাবাগণ নিবেদন করলেন, "হ্যাঁ, হে রাসূল আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমাদেরকে অবহিত করুন।" তিনি বললেন, "তবে শোন, সবচেয়ে গুনাহ্ হলো- খোদার শিরক (অংশিবাদিতা), এরপর সব থেকে বড় পাপ হলো- পিতা মাতার সেবা যত্নে অবহেলা প্রদর্শন," এবং তারপর (একথা বলার সময় তিনি (সা.) বালিশে-হেলান ছেড়ে দিয়ে উঠে বসলেন এবং প্রচন্ড আবেগের সাথে বললেন) "মিথ্যা বলা সবচেয়ে বড় গুনাহ্!" একথা তিনি এতবার বলতে থাকলেন যে, আমরা (সাহাবীগণ) তাঁর (সা.) কষ্টের কথা বিবেচনা করে মনে মনে বললাম 'খোদা করুন তিনি যেন এখন চুপ হয়ে যান এবং আর ক্লান্ত না হন।'

এ সহীহ্ হাদীসটিতে একটি অতি সূক্ষ্ম নৈতিকতার শিক্ষা রয়েছে। প্রত্যেক খাঁটি মুসলমান এবং খাঁটি আহমদীকে একে নিজের জন্য রক্ষাকবচ করে নিতে হবে। সবচেয়ে প্রথম কথা হলো 'শিরক' অর্থাৎ খোদার সাথে কোন জিনিসকে অংশীদার গণ্য না করা। কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে শিরক বলতে মুর্তিপূজা বা বাহ্যিক শির্ক নয়। কারণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কলেমা তাইয়্যেবার সাথেই তো মুর্তি পূজার অবসান হয়ে যায়, যা বলতে গেলে ইসলামের প্রবেশদ্বার এবং তাছাড়াও ঈমান বিল গায়েব (অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস)-এর মধ্যে এর কথাও এসে গেছে। সুতরাং, এখানে শিরক এর অর্থ 'গোপনীয় শিরক'-যাতে দুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল অধিকাংশ মুসলমান এবং কতক আহমদীও ভুলে জড়িয়ে পড়ে।

গোপনীয় শিরকের অর্থ হলো- কোন বস্তুকে এরূপ মর্যাদা দান করা যা শুধু খোদাকে দেয়া উচিত, অথবা কোন জিনিসের প্রতি এরূপ ভালবাসার সম্পর্ক রাখা যা কেবল খোদার সাথেই রাখা সঙ্গত, অথবা কোন জিনিসের উপর এরূপ নির্ভর করা যা কেবলমাত্র খোদার উপরই করা কর্তব্য। ধর্মীয় ও জাগতিক বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মে প্রকাশ্য তদ্বিরের উপায় অবলম্বন করতে ইসলাম কখনও নিষেধ করে না, কিন্তু এগুলোর উপর ভরসা করতে এবং এগুলোকেই সফলতা লাভের চূড়ান্ত অবলম্বন মনে করতে অবশ্যই নিষেধ করে। কারণ, এটা এক গোপন শিরক। ইসলমী তওহীদের উন্নত দৃষ্টিভঙ্গি কোন অবস্থাতেই তা বরদাস্ত করতে পারে না। তোমাকে কোন পরীক্ষা দিতে হলে নিঃসন্দেহে পরিশ্রম করবে এবং অবশ্যই করবে, কিন্তু সফলতার শেষ অবলম্বন খোদাকে জ্ঞান করবে। তোমার বিরুদ্ধে কোন মামলা হলে অবশ্যই কোন উকিলের মাধ্যমে ঐ মামলার তদ্বির করবে এবং অবশ্যই করবে, কিন্তু এই কথাটি ভুলবে না যে, সফলতার শেষ চাবি খোদার হাতে রয়েছে। অসুস্থ হলে নিঃসন্দেহে তুমি অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা চিকিৎসা করাবে এবং অবশ্যই তা করাবে, কিন্তু মনে এই বিশ্বাস রাখবে আরোগ্যলাভের চূড়ান্ত কড়িকাঠ খোদার মুঠোয় রয়েছে। এটি একটি কঠিন স্তর। কিন্তু চিন্তা করলে দেখবে এটিই হচ্ছে তওহীদের প্রকৃত অবস্থান। হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহেস সালাম কতইনা সুন্দর বলেছেনঃ

"তোমার মনে খোদার বিপরীত যা কিছু রয়েছে তার প্রত্যেকটি তোমার জন্য একটি প্রতিমা। হে বিশ্বাসে দুর্বল ব্যক্তি! তোমার উচিত এই গোপন মূর্তিগুলো থেকে সাবধান থাকা এবং এগুলো থেকে নিজের হৃদয়ের প্রান্ত বাঁচিয়ে রাখা।"

দ্বিতীয় শিক্ষা যা এই হাদীসে দেয়া হয়েছে তা হলো- **পিতা-মাতার সেবা যত্নের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন সম্বন্ধে।** ইসলাম এটাকে গোপন শিরকের পরেই দ্বিতীয় নম্বরের পাপ বলে গণ্য করেছে। স্মরণ রাখা উচিত, মাতা- পিতার অবাধ্যতা বলতে মাতা পিতার অবাধ্যতাই শুধু নয়, কারণ এটাতো একটা 'না' বাচক ধরনের জিনিস। বরং পিতা-মাতাকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করা, তাদের সেবা যত্নের প্রতি

মনযোগী না হওয়া এবং তাদের আবেগের প্রতি লক্ষ্য না রাখাও এই আদেশের মর্মের অন্তর্ভূক্ত। একারণেই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আল্লাইহে ওয়াসাল্লাম অন্যত্র এ ক্ষেত্রে 'আন্তরিকতার সাথে' শব্দ ব্যবহার করেছেন যার মধ্যে পিতা-মাতার আনুগত্য, সেবা ও ভালবাসার অর্থও বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে অনেক মুর্খ লোক নিজ স্ত্রীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা অথবা সন্তানের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আকর্ষণের কারণে পিতা মাতার সেবা এবং তাদের প্রতি যথাযথ ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অমনযোগী হয়ে চলেছে, অথচ ইসলাম পিতা-মাতাকে অতি উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। মায়ের সম্বন্ধে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মায়ের পায়ের নীচে বেহেশত"। কুরআন শরীফ বলে, কারো পিতা-মাতা যদি তাকে শিরকের শিক্ষা দেয় এবং কোন বস্তুকে খোদার হুকুমের অনুরূপ গণ্য করে, সেক্ষেত্রে সন্তানের অবশ্য কর্তব্য হবে এরূপ আদেশ ছাড়া পিতা-মাতার অন্য সব আদেশ মান্য করা। সুতরাং, নিঃসন্দেহে আপন স্ত্রীদের সাথে সদ্ব্যবহার এবং সন্তানদের আদর যত্নে প্রতিপালন করা মুসলমানদের জন্য ফরয। বিষয়টির প্রতি ইসলামে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ "যদি শ্রেণীমত না কর, তা হলে তা হবে অধর্ম।"

তৃতীয় বিষয় যা উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা সত্যবাদিতার সাথে সম্পর্কিত। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) মিথ্যাকে এরূপ ঘৃণা করতেন এবং মুসলমানদের সত্য বলার অভ্যাস সৃষ্টির জন্য তাঁর মনে এরূপ প্রচন্ড আবেগ ছিল যেরূপ এই হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। হুযূর মিথ্যার বিরুদ্ধে উপদেশ দান কালে আবেগের তাড়নায় উঠে বসলেন এবং বার বার বললেনঃ

"কান খুলে শোনো! হ্যাঁ পুণরায় কান খুলে শোন! শিরক ও পিতা-মাতার অবাধ্যতার পরে সবচেয়ে বড় গুনাহ্-মিথ্যা বলা"। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা বলা নিজের জন্যই শুধু এক নিকৃষ্ট ধরণের পাপ নয় বরং মিথ্যা অন্য পাপের উৎসাহ যোগায় এবং তার উপর পর্দা বিছিয়ে পাপের ধারাকে প্রলম্বিত করতে থাকা এটার এক অপবিত্র কলকজাও বটে। সুতরাং প্রত্যেক আহমদীর অবশ্য কর্তব্য যে, মিথ্যাকে সে এমনভাবে ঘৃণা করবে- যেরূপে এক গলিত লাশকে ঘৃণা করা হয়।

সন্তান-সন্ততিদের সর্বদা সৎসংসর্গ দেবার চেষ্টা করা উচিতঃ

নৈতিক গুণাবলী সম্পন্ন সুন্দর মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার জন্য যেসব মৌলিক বিষয়াবলী রয়েছে সেগুলোর মধ্যে সৎসংসর্গ বিশেষ স্থান দখল করে আছে। পন্ডিতগণ বলেছেন- সৎসঙ্গে স্বর্গ বাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। ইংরেজীতে বলা হয়েছে A man is khown by the company he keeps. সুতরাং শৈশব কাল থেকে সন্তান-সন্ততি যাতে ভাল স্বভাবের সন্তান সন্ততির সংসর্গে থাকে, সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। একদিনেই কেউ খারাপ হয়ে যায় না। খারাপ সন্তান সন্ততিদের সাথে চলতে চলতে, তাদের অসৎ চাল চলনে ও কুপরামর্শে সন্তান সন্ততি নষ্ট হতে থাকে। পিতা-মাতা যদি হুশিয়ার না হন তাহলে ধরতেই পারেন না যে, তাদের ছেলে বা মেয়ে নষ্ট হতে চলেছে। পিতা মাতার অজ্ঞতা ও অবহেলার কারণে যে আমাদের দেশে বাল্য অপরাধ বহুল আকারে সংঘটিত হচ্ছে ক'জনইবা তার খবর রাখেন। সুতরাং ছোট বেলা থেকে সন্তান সন্ততিদের শেখাতে হবে তারা বন্ধু বান্ধব নির্বাচন করার সময়ে যেন সৎ স্বভাবের ছেলে-মেয়েদের দেখে তা নির্বাচন করে। কুরআন মজীদও আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে **কুনূ মায়াস্ সদেকীন** অর্থাৎ সত্যাশ্রয়ী লোকদের সাহচর্যে থাক। সন্তান সন্ততিদের সর্বদা সৎ ও সাধু লোকদের জীবন বৃত্তান্ত শুনান দরকার এবং তাদের মত হওয়ার জন্য উৎসাহ উদ্দীপনা যোগান দরকার। এখানে এ বিষয়টিও উল্লেখ যোগ্য, শিশুদের সামনে কখনও কারও গীবত (পরচর্চা) করা উচিত নয়।

সন্তান সন্ততির জন্য পিতা-মাতার দোয়া যাদুর মত কাজ করেঃ

যেসব দোয়া কবুলিয়্যতের মর্যাদা রাখে, সন্তান সন্ততির জন্য পিতা-মাতার দোয়াগুলো এর অন্যতম। তাই নৈতিক অবক্ষয় রোধে সন্তান সন্ততির জন্য পিতামাতার দোয়ার প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের পরে হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত সৈয়্যদনা নুসরৎ জাহাঁ বেগম সাহেবা তাঁর সন্তানদের লক্ষ্য করে যে মূল্যবান কথা বলেছিলেন তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তিনি বলেছিলেন: "সন্তানেরা, কেবল তোমাদের ঘর জাগতিক সম্পদশূন্য বলে তোমরা কখনও ভেবো না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের জন্য কিছু রেখে যান নি। তিনি তোমাদের জন্য দোয়ার বড় ভান্ডার রেখে গেছেন এবং যথাসময়ে তোমরা তোমাদের সম্পদ পেতে থাকবে।"

পরবর্তীকালে ইতিহাস তার সাক্ষ্য, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সন্তানেরা ঐ দোয়ার বরকত কীভাবে লাভ করে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণে ভূষিত হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, সন্তান সন্ততির জন্য পিতা মাতার দোয়া যাদুর মত কাজ করে। সন্তান-সন্ততিকে মানুষের মত মানুষ তথা আল্লাহ্ ওয়া'লা মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এ পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করার সাথে সাথে যদি সর্বশক্তিমান খোদার দরবারে পিতা মাতা আকুতি মিনতি সহকারে দোয়া করতে থাকে তাহলে সন্তান সন্ততির জীবন সুন্দরভাবে গড়ে ওঠবে একথা জোর দিয়েই বলা চলে।

বর্তমানে যুব সমাজের মধ্যে যে অবক্ষয়ের ঢল নেমেছে তার প্রধানতম কারণ সন্তান সন্ততির প্রতি পিতা মাতার সুদৃষ্টির অভাব এবং তাদের সামনে আদর্শ দেখানোর ব্যর্থতা। সন্তান-সন্ততি বড়ই নেয়ামত। এদেরকে যথাসময়ে কদর না করলে, পরে আফসোস করতে হয়। পিতা মাতার সুদৃষ্টি ও আন্তরিক দোয়ায় সন্তান সন্ততির জীবন সার্থক হতে পারে।

যুগ ইমাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ) ইসলামী শিক্ষার আলোকে নৈতিক অবক্ষয় রোধে **১৮৯৬** সনে লাহোরের টাউন হল এ অনুষ্ঠিত বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলনে যে ঐতিহাসিক বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন, সেখানে হুযূর (আ.) বলেছিলেন, মানুষের প্রকৃত নৈতিকতা অর্থাৎ চারিত্রিক গুণাবলী দুই প্রকার। প্রথমত: সেই আখলাক, যা দ্বারা মানুষ গর্হিত আচরণ থেকে নিবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, ঐ সকল নৈতিক গুণ যা মানুষ কল্যাণকর আচরণে সক্ষম হয়। অকল্যাণ বা অনিষ্ট ত্যাগ অর্থে ঐসব আখলাককে বুঝায়, যা দ্বারা মানুষ চেষ্টা করে যেন, তার জিহ্বা, তার হাত, তার চক্ষু, বা তার অন্য কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা অন্যের সম্পদ, সম্মান বা প্রাণের কোন ক্ষতি সাধন না হয়, কিংবা কোন অনিষ্টের ইচ্ছা না হয়। কল্যাণ বা হিত সাধন অর্থে সেই সম্যক গুণকেই বুঝায়, যদ্দারা মানুষ চেষ্টা করে, যেন তার জিহ্বা, হাত, বা জ্ঞান দ্বারা বা অন্য কোন উপায়ে অন্যের ধন বা সম্মানের কল্যাণ সাধন করতে পারে, কিংবা তার প্রতাপ বা সম্মান প্রকাশে সাহায্য করতে পারে। কিংবা কেহ তার প্রতি কোন অবিচার করে থাকলে অত্যাচারী যে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, তা সে ছাড়িয়া দেয় এবং এই প্রকারের তাকে কষ্ট পাওয়া হতে এবং দৈহিক ও আর্থিক দন্ড হতে নিরাপদ রাখার মত উপকার সাধন করে বা তাকে এতটুক সাজা দেয়, যা প্রকৃত পক্ষে তার জন্য প্রত্যক্ষ করুণাস্বরূপ হয়। (চলবে)

খলীফার আনুগত্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত

সংকলন : **মুহাম্মদ আক্রামুল ইসলাম**
শিক্ষক, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

"এতায়াত" শব্দের অর্থ শুধু আনুগত্য নয় বরং এমন আনুগত্য যা সন্তুষ্টচিত্তে করা হয় এবং এতে নিজের ইচ্ছা ও পছন্দের বিষয়টিও পাওয়া যায়।

আনুগত্য কেবল তাকে বলে যাতে সন্তুষ্টচিত্তে আল্লাহ্ তাআলার হুকুম আহকাম পালন করা হয়। এবং এগুলো পালন করার সময় মানুষ পরিতৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করে।

এই আনুগত্যের বাস্তব দৃষ্টান্ত কুরআন মজীদেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আ.) স্বপ্নে নিজের ছেলেকে কুরবানী করার দৃশ্য দেখেছেন এবং তাঁর প্রিয় অল্প বয়সী ছেলে ইসমাঈল (আ.) পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট চিত্তে কুরবানী হওয়ার জন্য তৈরী হয়ে গেছেন। তাঁর ছেলে হযরত ইসমাঈল (আ.)-ও খুশি মনে বলেছিলেন, হে আমার পিতা! যে আদেশ-ই থাকুন না কেন আপনি তা পূর্ণ করুন (সাফফাত : ১০৩) আমার চিন্তা করবেন না, আমিও আল্লাহ্ তাআলার সকল আদেশে খুশি মনে কুরবানী হওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।

আঁ- হযরত (সা.)ও বলেছেন, মু'মিনের উদাহরণ তো লাগাম বাঁধা উটের মত, একে যেদিকে নিয়ে যাবে এটা সেদিকেই চলতে থাকে এবং আনুগত্যে অভ্যস্ত হয়। (মুসনাদ আহমদ, ৪র্থ খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর বিলিনতা, আত্মত্যাগ ও আনুগত্য সম্পর্কে বলেছেন,–"তিনি আমার প্রতিটি বিষয়ের এভাবে অনুসরণ করেন যেভাবে নাড়ী স্পন্দন হৃদয়ের অনুসরণ করে।"

এটাই সে আনুগত্য যার প্রত্যাশা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সা.) আমাদের কাছে রাখেন।

খিলাফতের আনুগত্যের জন্য খিলাফতের গুরুত্ব জানাও জরুরী। খিলাফত কি? এটা সেই "উর-ওয়াতুল উসক্বা" যা ভঙ্গে না এবং যে কেউ একে আকড়ে ধরে রাখবে সে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পাবে। খিলাফত সেই হাবলুল্লাহ (আল্লাহ্ তাআলার রজ্জু) যা আমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সান্নিধ্য দেয় এবং সব ধরনের বিভক্তি ও বিশৃংখলা হতে বাঁচায়। খিলাফত সেই শাজারায় তাইয়্যেবাহ (পবিত্র বৃক্ষ) যার সাথে সম্পৃক্ত থাকার মাধ্যমেই আমরা সবুজ শ্যামল থাকতে পারি। যে এই পবিত্র বৃক্ষ হতে পৃথক হয় সে তো শুকনো কান্ডের মত যা কর্তনযোগ্য।

খলীফা নবীর স্থলাভিষিক্ত এবং তিনি প্রতিচ্ছায়ারূপে তাঁর মাঝে রাসূলের পরিপূর্ণতাকে ধারন করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ সম্বন্ধে বলেছেন, " মানুষের পক্ষে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করা সম্ভব নয়, এজন্য আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করেছেন যেন তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে অভিজাত রাসূলগণের অস্তিত্বকে প্রতিচ্ছবি রূপে কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রাখেন। সুতরাং এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ্ তাআলা খিলাফতকে নির্বাচন করেছেন, যাতে কখনো এবং কোন যুগেই এ পৃথিবী রিসালাতের কল্যাণ হতে বঞ্চিত না হয়। (শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সূরা গাশিয়ার ১৮ নম্বর আয়াতের তফসীর করতে গিয়ে বলেছেন, "উটের মাঝে একে অপরের আনুগত্য ও এতায়াত করার শক্তি রাখা আছে। দেখো! উটের (চলার সময়) একটা লম্বা কাতারবদ্ধ হয়ে থাকে এবং এক উট আরেক উটের পিছনে এক বিশেষ অনুমান ও গতিতে চলে আর ঐ উট যেটি সবার সামনে ইমামরূপে নেতৃত্বে থাকে সেটি থাকে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ ও পথ সম্বন্ধে অবহিত। একে অপরের পিছনে সব উট সমগতিতে চলে। এদের কোনটির মনেই সমগতিতে চলার ক্ষেত্রে গতি পরিবর্তনের আকাঙ্খা জাগ্রত হয়

একই ভাবে সমাজিক ও ঐক্যবদ্ধ অবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখতে একজন ইমাম বা নেতা থাকা আবশ্যক। অত:পর এ কথাও মনে রাখা উচিত যে, এ কাতার সফরের সময় হয়ে থাকে। সুতরাং পৃথিবীর সফরকে সুশৃঙ্খল করার জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত একজন ইমাম না থাকবেন, মানুষ এলোমেলো হয়ে ধ্বংস হতে থাকবে। (মলফুযাত, ১ম খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা)

ইমামকে মানা ও তাঁর আনুগত্য করার আরেকটি কারণ, যে, আঁ-হযরত (সা.) হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামেন (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, যদি তুমি শিরকের যুগ পাও তখন তুমি জামা'ত ও তাদের ইমামকে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখো যদি জামাতও না থাকে আর ইমামও না থাকে তবে সমস্ত ফিরকা (দল) হতে পৃথক হয়ে যাবে যদিও তোমাকে গাছের শিকড় খেয়ে বাঁচতে হয়। (বুখারী কিতাবুল ফিতান)

আরেক স্থানে আঁ হযরত (সা.) হযরত হুযায়ফা (রা.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন, তুমি যদি আল্লাহ্‌র খলীফাকে পৃথিবীতে দেখতে পাও তবে তুমি তাঁকে আকড়ে ধরে রেখো যদিও তোমার শরীর চিরে ফেলা হয় এবং তোমার সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয়। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল ২২৯১৬ নম্বর হাদীস)

এসব হাদীসসমূহে আঁ হুযূর (সা.) আমাদেরকে তাগিদপূর্ণ আদেশ করেছেন, তোমরা ইমামের সাথে চিমটে থেকো এবং তাঁকে তোমরা ছেড়ে দিয়ো না যদিও এর পরিণামে তোমাদের শরীর চিড়ে ফেলা হয়, তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তোমাদেরকে গাছের শিকড় খেয়ে জীবনধারন হয়। এরপরও তোমরা ইমাম হতে পৃথক হয়ো না, নয়তো তোমরা আধ্যাত্মিক ভাবে মারা যাবে।

সূরা নূরের আয়াতে ইস্তেখলাফ-এ আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদের সাথে খিলাফতের অঙ্গীকার করেছেন, এরপরের আয়াতে আছে, আর তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং রাসূলের এতায়াত কর যাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়। (সূরা নূর : ৫৭)

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এর তফসীরে বলেন, যখন খিলাফতের নেযাম (বা ব্যবস্থাপনা) চালু করা হয় তখন তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায় যে, তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং একইভাবে আল্লাহ্ তাআলার রাসূলের এতায়াত কর। খলীফগণের সাথে যারা ধর্মের দৃঢ়তায় কাজ করে যেন তারা রাসূলের এতায়াতকারী বলেই অভিহিত হবে। এটা সেই সূক্ষ্ম দিক যা রাসূল করীম (সা.) এ শব্দ মালার মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন, যে আমার মনোনীত আমীরের এতায়াত করে সে আমারই এতায়াত করে এবং যে আমার মনোনীত আমীরের অবাধ্য হয় সে আমার অবাধ্যতা করে। (তফসীর কবীর ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৬৭ পৃষ্ঠা।

এতায়াতে রাসূলও খলীফাকে ব্যতীত হতে পারে না, যা এ আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। কেননা রাসূলের এতায়াতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, সবাইকে যেন তৌহিদের এক পথে তুলে দেয়া হয়.......। একটি নিযাম অনুসরণের কারণে সাহাবায়ে কেরামের (রা.) মাঝে এতায়াতের রূহ (বা স্প্রীড) চরম শিখড়ে পৌঁছেছিল। যেমন, রাসূল করীম (সা.) যখনই তাঁদেরকে কোন আদেশ দিতেন সাহাবা (রা.)গণ তখনই সে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন..এতায়াতের উপকরণ নেযাম ব্যতীত সৃষ্টি হতে পারে না। কাজেই, যখনই খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই এতায়াতে রাসূলও হবে। (তফসীরে কবীর ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৬৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলা ইবাদত সমূহের মধ্যে বা-জামাত নামাযের প্রতি সবচেয়ে বেশি তাকিদ দিয়েছেন–এতে কী হিকমত বা প্রজ্ঞার বিষয় থাকতে পারে? দিনে পাঁচবার সমস্ত মুসল্লিদেরকে তাদের ইমামের সাথে রুকু ও সিজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছে। যেন তৌহিদের কার্যত প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এক আওয়াজে উঠা ও বসার ট্রেনিং দেয়া হয়েছে। জুমুআ ও ঈদের সময় সকল ছোট মসজিদগুলোর ইমামগণও জুমুআ ও ঈদের ইমামের পিছনে রুকু ও সিজদা করে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে এভাবে তরবীয়ত করেছেন যে, তোমাদেরকে এক ইমামের আনুগত্য করতে হবে।

এজন্যই নামাযের ইমাম, যারা অল্প কয়েকজন মুক্তাদির ইমাম হয়ে থাকেন তাদের সম্পর্কে আঁ-হযরত (সা.) বলতে গিয়ে বলেছেন–তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কি এ বিষয়কে ভয় করে না যে, যখন সে তার মাথা ইমামের আগে উঠায় তখন আল্লাহ্ তাআলা তার মাথাকে গাধার মাথা বানিয়ে দেন। (বুখারী কিতাবুল আযান)

যদি কোন ব্যক্তি মানুষের বানানো অল্প কিছু মুক্তাদির ইমাম হতে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করায় গাধার মাথাওয়ালা বলে অবহিত হয়, তবে সেই ইমাম যিনি আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক মনোনীত হন এবং তিনি সমস্ত পৃথিবীর ইমাম হন, যার হাতে সবাই বয়াআত করে তাঁর আনুগত্য করা কতটুকু জরুরী আর অবাধ্যতাকারী কত বড় পাপী!

যে কোন লোক তার ইমামের পরিপূর্ণ আনুগত্য করে না সে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়, যেভাবে জঙ্গে আহাদের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) একটি গিরিপথ সম্পর্কে বলেছিলেন, যদি আমরা মারা যাই অথবা বিজয়ী হই, তোমরা এই গিরিপথ ছেড়ো না কিন্তু বিজয় এসে গেছে ভেবে যখন সাহাবাগণ গিরিপথ ছেড়ে দিয়েছেন। শত্রুরা তখন গিরিপথটি খালি দেখতে পেয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং আক্রমণ করেছে, যার ফলশ্রুতিতে মুসলমানদের বেশ ক্ষতি সাধিত হয় এবং আঁ-হযরত (সা.) আহত হন। এ ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,

তাঁরা যদি বুঝত যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি আদেশের ফলশ্রুতিতে সারা পৃথিবীর লোকদেরকে যদি তাদের জীবন উৎসর্গ করতে হয় তবুও সেটা একটি মূল্যহীন বিষয়। যেখানে রাসূল করীম (সা.) তাঁদেরকে এই উপদেশ দিয়ে দাঁড় করিয়ে ছিলেন যে, যদি আমরা বিজয়ী হই বা মারা যাই, তোমরা এ স্থান হতে নড়বে না–তাঁরা যদি স্বইচ্ছায় গিরিপথটি না ছাড়াত তবে শত্রুরা না দ্বিতীয় বার আক্রমণ করার সুযোগ পেত আর না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ও তাঁর সাহেবাগণের কোন ক্ষতি হত। আল্লাহ্ তাআলা এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এ বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সেসব লোক যারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদেশসমূহের পরিপূর্ণ অনুগত্য না করবে এবং নিজেদের প্রচেষ্টাকে নবী করীম (সা.)-এর আদেশের উপর প্রাধান্য দিবে। তাদের ভয় করা উচিত, এর ফলে তাদের উপর কোন বিপদ না আপতিত হয় অথবা তারা কোন ভয়ঙ্কর আযাবের সম্মুখীন না হয়। তিনি বলেছেন, তোমরা যদি সফলতা লাভ করতে চাও তবে তোমাদের কাজ হচ্ছে, ইমামের হাত উঠার ইশারা করে উঠলে তোমরা উঠো এবং বসার ইশারা করে নামলে বসে পরো। (তফসীরে কবীর, ৬ষ্ঠ খন্ড ৪১১-৪১২ পৃষ্ঠা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন :

“আল্লাহ্ তাআলার, তাঁর রাসূলের এবং রাজার আনুগত্য কর। এতায়াত এমন একটি জিনিস, যদি আন্তরিকতার সাথে করা হয় তবে হৃদয়ে অধিক নূর এবং আত্মায় স্বাদ ও জ্যোতির আগমন ঘটে। চেষ্টা প্রচেষ্টার ততটা প্রয়োজন নেই যতটা প্রয়োজন রয়েছে এতায়াতের। কিন্তু হ্যাঁ একটি শর্ত রয়েছে, আন্তরিকতার সাথে এতায়াত হতে হবে আর এটাই একটি কঠিন বিষয়। এতায়াতের জন্য নিজের কামনা-বাসনা জলাঞ্জলি দেয়া আবশ্যক। এছাড়া এতায়াত হতে পারে না আর কামনা-বাসনা এমন একটি জিনিস যা বড় বড় একত্ববাদ ব্যক্তির হৃদয়েও মুর্তি হতে পারে। সাহাবাগণের (রা.) কেমন ফযল ছিল এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এতায়াতে কেমন বিলীন জাতি ছিলেন। এটা সত্য কথা যে, কোন জাতি জাতি বলে অভিহিত পারে না এবং তাদের মাঝে ঐক্য ও মিলনের রুহ ফুৎকার করা হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা আনুগত্যের নীতি অনুসরণ করে।

এতে এটাইতো নিগুঢ় তত্ত্ব যে জামা'তের উপর আল্লাহ্‌র হাত থাকে। আল্লাহ্ তাআলা তৌহিদ বা একত্ববাদ পছন্দ করে আর এই একত্ববাদ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ না এতায়াত করা হয়। নবী করীম (সা.)-এর যুগের সাহাবাগণ অনেক বিচক্ষণ ছিলেন। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে গড়ে ছিলেনই এভাবে। তাঁরা রাষ্ট্র বিজ্ঞানের নীতি সম্পর্কেও অনেক অবগত ছিলেন কেননা পরবর্তীতে যখন হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম খলীফা হয়েছেন তাঁদের হাতে যখন রাজত্ব এসেছে তখন তাঁরা যে যোগ্যতা এবং শৃঙ্খলার সাথে রাজ্যের চড়াই-উৎড়াই নিয়ন্ত্রণ করেছেন, এ থেকে খুব ভালভাবে বুঝা যেতে পারে যে, তাদের মাঝে বিচক্ষণতার কতটা যোগ্যতা ছিল কিন্তু রাসূল করীম (সা.)-এর সম্মুখে তাঁদের এমন অবস্থা ছিল যে, যেখানে তিনি (সা.) কিছু বলেছেন তাঁরা তাঁদের নিজেদের বিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে তার সামনে তুচ্ছ ও নগণ্য মনে করেছেন এবং নবী করীম (সা.) যা কিছু বলেছেন, তাকেই তারা অবশ্যকরণীয় বিষয় মনে করতেন।

নির্বোধ বিরোধীরা বলে থাকে, তরবারির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার ও প্রসার করা হয়েছে কিন্তু আমি বলছি, এটা সঠিক নয়। প্রকৃত কথাটি হচ্ছে, আনুগত্যের পানি হৃদয়ের শিরা উপশিরায় টইটুম্বুর হয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। এটা ছিল সেই এতায়াত ও ঐক্যের ফল যা অন্যান্য হৃদয়সমূহকেও প্রভাবিত করেছে।.......এতায়াত যদি করতে হয় তো তেমন এতায়াত কর, পরস্পর ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সম্পর্ক যদি করতে হয় তো তেমন ভালবাসা ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি কর। সব রং ও রূপের দিক থেকে সাহাবায়ে কেরামের পথ অনুসরণ কর। (তফসীর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ২য় খন্ড, ২৪৮-১৪৮-পৃষ্ঠা)

এখন আমি আপনাদের সম্মুখে আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবাগণের (রা.) কিছু ঘটনা বর্ণনা করছি।

বদরের যুদ্ধের সময় হযরত সিকদার বিন আসওয়াদ (রা.) রাসূল করীম (সা.)-এর সমীপে বলেন, হে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)! আমরা মূসার জাতির মত একথা বলবো না, “তুমি ও তোমার প্রভূ যুদ্ধ কর।” বরং আমরা আপনার ডানেও লড়বো, বামেও লড়বো, সামনেও লড়বো, পিছনেও লড়বো এবং সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আপনার জীবন, আপনি যদি আপনার বাহনকে 'বারুকুল গিমাদ' পর্যন্তও নিয়ে যান তবুও আমরা আপনার আনুগত্য করবো। (সীরাত হালবিয়াহ্, ৩য় খন্ড, ৩৮৬ পৃষ্ঠা)

এটা শুধু তাদের দাবী ছিল না বরং মক্কার কাফেররা যখন এজন্য তাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করল যে, দেখে এসো মুসলমাদের শক্তি সামর্থ কেমন। তাদের প্রতিনিধি ফিরে আসল এবং বলল, মুসলমানরা নি:সন্দেহে ৩১৩ জন্য কিন্তু হে আমার জাতি! তোমাদের জন্য আমার পরামর্শ, তোমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করো না। আমি সেখানে উটের উপর কোন মানুষ নয় বরং মৃত্যু দেখেছি।

এক যুদ্ধে বৃষ্টির মত তীর আসছিল এবং হযরত তালহা (রা.) তাঁর হাত আঁ হযরত (সা.)-এর পবিত্র মুখমন্ডলের সামনে রেখেছিলেন। তীর আসছিল, তাঁর (রা.) হাতে লাগছিল কিন্তু তালাহা উফ শব্দটিও করছিলেন না শুধু এজন্য, যদি হাত নড়ে যায় আর কোন তীর ছুটে আঁ-হযরত (সা.)-এর গায়ে লাগে। তালহা (রা.) তাঁর হাত ক্ষত বিক্ষত করেছিলেন কিন্তু একটি তীরও আঁ-হযরত (সা.)-এর পবিত্র মুখমন্ডলের দিকে যেতে দেননি।

সাঈদ বিন রাবী (রা.) ওহুদের যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে মুমর্ষ অবস্থায় ছিলেন। আঁ হযরত (সা.) মুহাম্মদ বিন মুসলেমাকে সাঈদের অবস্থা জানার জন্য পাঠালেন। মুহাম্মদ বিন মুসলেমাহ ওহুদের যুদ্ধক্ষেত্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লাশের মাঝে তাঁকে খুজছিলেন এবং ডাকছিলেন কিন্তু কোন উত্তর পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি উচ্চ স্বরে ডাকলেন যে, হে সাঈদ বিন রাবী! রাসূল করীম (সা.) আমাকে তোমার খবর নেয়ার জন্য পাঠিয়েছে। এই ডাক শোনার সাথে সাথে লাশের মাঝে এক ধরনের নড়াচড়ার মত হলো এবং সা'য়দের ক্ষীণ আওয়াজ এলো। মুহাম্মদ বিন মুসলেমাহ রাসূলুল্লাহ্‌র পয়গাম দিলে তিনি বলেন, আমি তো এখন মৃত্যু পথযাত্রী। রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আমার সালাম পৌছে দিও এবং আমরা যেভাবে ওয়াদা পূর্ণ করেছি তোমরাও তোমাদের ওয়াদাপূর্ণ করো (সীরাত হালবিয়াহ, ২য় খন্ড, ২০২-২০৩ পৃষ্ঠা)

মদ পানের মজমা বসেছিল হাতে হাতে মদের পেয়ালা ফিরছিল এমন সময় কেউ একজন ঘোষণা দিল মদ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ কথা শুনে কেউ একজন বলল, জিজ্ঞাসা তো করে দেখ, আসলেই ঠিক কি না? কিন্তু আরবের নেশায় চুড় লোকেরা এক পথচারীর এ কথায় শুনে যে, মদ নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, মদের মুটকি ভেঙ্গে ফেলেন আর মদীনার অলি-গলিতে স্রোত ধারায় মদ প্রবাহিত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে তাঁরা কেউ মদের কাছেও যাননি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর প্রিয় মুরিদ

মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব সম্পর্কে বলেন, মৌলভী হাকীম নূরুদ্দীন সাহেব তাঁর এখলাস, ভালবাসা, অন্যকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়া আল্লাহ্ তাআলার পথে দানশীলতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে আশ্চর্যজনক মর্যাদা রাখতেন। অনেককেই তো আল্লাহ্‌র রাস্তায় ধন-সম্পদ খরচ করতে দেখেছি। কিন্তু নিজে ক্ষুধার্ত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের প্রিয় সম্পদ দান করতে এবং পৃথিবীতে নিজের জন্য কোন কিছু না করতে দেখিনি এসব বৈশিষ্ট্যাবলী পুর্ণ মাত্রায় উপরোল্লিখিত মৌলভী সাহেবের মাঝেই দেখেছি অথবা তাঁদের মাঝে দেখেছি যাদের হৃদয়ের উপর তাঁর সংস্পর্শের প্রভাব রয়েছে........ তাঁর সম্পদের মাধ্যমে আমি যতটা সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছি এখন পর্যন্ত আমার নিকট এর কোন দৃষ্টান্ত নেই। আল্লাহ্ তাআলা এ উম্মতের মাঝে এমন স্বভাব ও সাহসের লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দিন। আমীন সুম্মা আমীন। (নিশানে আসমানী, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ৪০৭)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সব বিষয়ে তিনি আমাকে এমনভাবে অনুসরণ করেন নাড়ী যেভাবে হৃদস্পন্দনকে অনসুরণ করে এবং আমি তাঁকে আমার সন্তুষ্টির মাঝে বিলীন হওয়া লোকদের মত দেখতে পাই। (আয়নায়ে কামালতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন ৫ম খন্ড, ৫৮৬ পৃষ্ঠা)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইমামের এতায়াতে বিলীন হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবের নিকট টেলিগ্রাফ পাঠিয়েছিলেন, দিল্লী আস, টেলিগ্রাফ বার্তা লেখক লিখে দেয় অনতিবিলম্বে চলে আস। যখন এ টেলিগ্রাফটি কাদিয়ান পৌঁছে হযরত মৌলভী সাহেব তখন তাঁর চেম্বারে বসেছিলেন, আদেশ পালনে যাতে দেরি না হয় এজন্য তিনি তখনই সেখান থেকে রওয়ানা দেন, ঘরেও যাননি, পোশাকও পরিবর্তন করেন নি, বিছানা-পত্রও সাথে নেন নি, এমনকি পকেটে ট্রেনের ভারা পর্যন্ত ছিল না কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল নিজের মনিবের আদেশ পালন করা আর আল্লাহ্ তাআলাও তাঁকে অলৌকিকভাবে সাহায্য করেন এবং একজন হিন্দু রোগীকে স্টেশনে প্রেরণ করেন আর সে তাঁকে ভিজিটস্বরূপ দিল্লীর টিকেট ও প্রয়োজনীয় অর্থ দেয়। এভাবে তিনি (রা.) মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সেবায় নিয়োজিত হন।

(হায়াতে নূরুদ্দীন, পৃষ্ঠা-২৮৫)।

তিনি (রা.) ভেড়াতে হাসপাতাল ও একটি জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু করেন। কিছু সামগ্রী কেনার জন্য লাহোর যান সেখান থেকে হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান চলে আসেন। ইচ্ছে ছিল খুব তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার আর তাই ফিরে যাওয়ার শর্তেই এক্কাগড়ি (এক ঘোড়ার গাড়ি) ভাড়া করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাত হলে হুযূর (আ.) বলেন, এখন তো আপনি কর্মব্যস্ততা হতে মুক্ত হয়েছেন? উত্তরে হযরত মৌলভী সাহেব (রা.) বলেন, জী হুযূর! এখন তো আমি কর্মব্যস্ততা হতে মুক্তই। এ কথা বলে সেখান থেকে উঠে এসে এক্কাওয়ালাকে বিদায় করে দেন। কিছু দিন পর হুযূর (আ.) বললেন, আপনার একা থাকতে কষ্ট হচ্ছে তাই আপনার একজন স্ত্রীকে ডেকে পাঠান। তিনি (রা.) তাঁর স্ত্রীকে ডেকে পাঠান এবং লিখেন নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দাও, হয়তো আমার আসতে দেড়ি হবে। তাঁর স্ত্রী আসার কিছু দিন পর হুযূর (আ.) বলেন, আপনার তো বই পড়ার প্রতি খুব আগ্রহ অতএব, আপনার লাইব্রেরীটি এখানে আনিয়ে নিন। এর কিছু দিন পর বলেন, আপনার অন্য স্ত্রী তো আপনার মানসিকতা সম্বন্ধে অবগত এবং পুরোন, তাকেও আনিয়ে নিন। পরবর্তীতে একবার বলেন, মৌলভী সাহেব! আপনার মন থেকে আপনার দেশ ভেড়ার কথা মুছে ফেলুন।

হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন বলেন, শুরুতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। এটা তো হতে পারে আমি যেন আর ভেড়া না যাই কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব যে, ভেড়ার কথা আমার মনেই পড়বে না। তিনি (রা.) বলেন, “আল্লাহ্ তাআলার লিলাও অদ্ভূত হয়ে থাকে। আমার কল্পনা এবং স্বপ্নেও আমার দেশের কথা মনে পড়েনি। পরে তো আমি কাদিয়ানের অধিবাসী হয়ে গেলাম।

বাটালার একজন ভদ্রলোকের স্ত্রী খুব অসুস্থ ছিল। হুযূর (আ.)-এর অনুমতি সাপেক্ষে তিনি বাটালা যাচ্ছিলেন এমন সময় হুযূর (আ.) বলেন, আশা করি আপনি আজই ফিরে আসবেন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। বাটালা গেলেন এবং রোগিনীকে দেখার পর ফিরে আসার জন্য মনস্থির করলেন কিন্তু এতো বৃষ্টি হলো যে, জল-স্থল একাকার হয়ে গেল। লোকেরা বলল, রাস্তা ভয়ঙ্কর এবং অনেক বৃষ্টি। আর আপনাকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। আপনি কাল যান। কিন্তু আনুগত্যের অগ্রদূত হযরত মৌলভী সাহেব বললেন, না, আমার নেতার আদেশ, আমাকে আজই কাদিয়ানে পৌঁছতে হবে। তিনি এক্কা নিলেন এবং রওয়ানা হয়ে গেলেন। পথে পায়ে হেঁটে চলতে হয় কাঁটার আঘাতে তাঁর পায়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এরপরও তিনি কাদিয়ান পৌঁছান এবং ফযরের নামাযের সময় উপস্থিত হন। হুযূর (আ.) জানতে চান, মৌলভী সাহেব কি এসেছেন? তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে বলেন, “হুযূর আমি ফিরে এসেছি।” এটা বলেননি আদেশ পালন করতে গিয়ে আমার পা আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে। তিনি তাঁর কষ্টের কথা একেবারেই উল্লেখ করেন নি।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, একটি মৌমাছির কাছ থেকে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে, সে কেমন প্রজ্ঞার সাথে ঘর তৈরী করে, মধু বানায়, দুর্গন্ধযুক্ত জিনিসের উপর বসে না আর নিজের নেতার আনুগত্য করে। (হাকায়েকুল ফুরকান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, বলা হয় খলীফার কাজ শুধু নামায পড়ানো এবং বয়আত নেয়া। একাজ তো একজন মোল্লাও করতে পারে, এজন্য তো কোন খলীফার প্রয়োজন নেই। আমি এ ধরনের বয়আতের উপর থু থুও ফেলি না। বয়আত তো তাকে বলে যাতে পরিপূর্ণ আনুগত্য করা হয় এবং খলীফার কোন একটি আদেশেরও অবাধ্যতা করা হয় না। (আল ফুরকানে খিলাফত, নম্বর মে-জুন ১৯৬৭ইং পৃষ্ঠা-২৮)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের আনুগত্য কোন দুর্বলতার জন্য ছিল না বরং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ছিল। অন্যদের দৃষ্টিতেও তো তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। একবার তিনি স্যার সৈয়্যদ আহমদ খানের কাছে জিজ্ঞাসা করেন, অজ্ঞ মানুষ পড়াশোনা করে জ্ঞানী হয়, জ্ঞানী উন্নতি করে হাকিম বা প্রজ্ঞাবান হয় আর প্রজ্ঞাবান উন্নতি করে সূফী হয়, কিন্তু সূফী উন্নতি করে কি হয়? স্যার সৈয়দ উত্তরে বলেন, নূরুদ্দীন হয়। (হয়াতে নূরুদ্দীন, পৃষ্ঠা-২১৭)

এই নূরুদ্দীন-ই যখন উন্নতি করে খিলাফতের আসনে সমাসিন হলেন তখন তিনি তাঁর জামাতাকে উপদেশ দিয়ে বলেন, শেষে আমি আরো একটি কথা বলতে চাই এবং এই তাগিদপূর্ণ উপদেশ দিচ্ছি যে,...আল্লাহ্‌র রজ্জুর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকো। কুরআন যেন তোমাদের জন্য জীবনবিধান হয়। পরস্পর কলহ করো না কেননা কলহ ঐশী কৃপাকে বাধাগ্রস্ত করে। মূসা (আ.)-এর জাতি এ ত্রুটির জন্যই জঙ্গলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু মুহাম্মদ (সা.)-এর জাতি সতর্কতা অবলম্বন করে সফলতা লাভ করেছিল। এখন তৃতীয়বার তোমাদের পালা এসেছে। কাজেই তোমাদের ইমামের হাতে তোমাদের অবস্থা এমন হওয়া উচিত যেভাবে এক মৃতব্যক্তির লাশ ধৌতকারীর হাতে থাকে। তোমাদের নিজস্ব সকল ইচ্ছা আকাঙ্খার যেন মৃত্যু হয়। তোমরা তোমাদের ইমামের সাথে নিজেদেরকে এভাবে সংযুক্ত কর যেভবে ট্রেনের বগিগুলো ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত থাকে। অত:পর প্রতিদিন লক্ষ্য করে দেখো, অন্ধাকার হতে বের হচ্ছে নাকি না? খুব বেশি ইস্তেগফার করো এবং দোয়ারত থাক। একত্বকে হাত থেকে যেতে দিও না। অন্যের সাথে পুণ্যকর্ম ও উত্তম আচরণ করার ক্ষেত্রে দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। ১৩শত বছর পর এ যুগ এসেছে, ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত এমন যুগ আর আসবে না। অতএব এ নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। কেননা শুকরি বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ফলে নেয়ামত বৃদ্ধি পায়। (খুতবাতে নূর পৃষ্ঠা ১৩১)।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর দোয়ার মাধ্যমে আমি এ প্রবন্ধের ইতি টানছি। হুযূর (রা.) বলেন, খিলাফত চিরজীবি হোক এবং এর চারপাশে যেন আত্মত্যাগী মু'মিনরা সমবেত থাকে। সত্যতা যেন তোমাদের অলঙ্কার, আমানত যেন তোমাদের সৌন্দর্য এবং তাকওয়া যেন তোমাদের পোশাক হয়। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের হোন আর তোমরা আল্লাহ্‌র হও। আমীন।

ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল লক্ষ্য

মাহমুদ আহমদ সুমন

মহান খোদা তাআলা এই পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানব জাতীর সংশোধনের জন্য। দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে শিরকে নিপতিত না হয়ে মানব জাতী যেন সৃষ্টি কর্তার ইবাদত করে আর এক খোদার সাথে কাউকে যেন শরীক না করে। সাবই যেন এক নেতৃত্বের অধিনে থেকে জীবন পরিচালিত করে এটাই খোদা তাআলার ইচ্ছা আর এ লক্ষ্যেই তিনি নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন। যারা খোদা তাআলার প্রত্যার্দিষ্টকে গ্রহণ করে নিয়ে তাঁর শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত থেকেছে তাদেরকে আল্লাহ্ কল্যাণ মন্ডিত করেছেন অপর দিকে যারা তাঁদের অশ্বিকার ও বিরোধীতা করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা ধ্বংস ও লাঞ্ছিত করেছেন।

আজ মুসলিম জাহানের অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বুঝা যায় তাদের অবস্থা কোন পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছে। সর্বত্রে জাতীর নেতার বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা হচ্ছে। সমগ্র মুসলিম জাহান আজ চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন। শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী মুসলমানরা আজ সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত হচ্ছে। এর কারণ কী? এর মূল কারণ হচ্ছে মুসলমান আজ পবিত্র কুরআনের আদেশ ও শ্রেষ্ঠ নবীর শিক্ষার উপর আমল করা ছেড়ে দিয়েছে যার ফলে মুসলমান সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের শিকার হয়ে বিধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। মুসলমানদের মাঝে আজ নেই ইসলামের প্রকৃত আদর্শ। মুসলমান শুধু আজ নামে আর লেবাসেই বিদ্যমান। সমগ্র বিশ্বে মুসলমানদের যে অবস্থা আজ আমরা দেখছি তা শ্রেষ্ঠ নবীর শ্রেষ্ঠ উম্মতের জন্য কাম্য ছিলনা। মুসলমানরা আজ শতধা বিভক্ত। তাদের মাঝে নেই কোন ঐশী ইমাম বা নেতা। যেহেতু তাদের মাঝে কোন ঐশী ইমাম নেই তাই অধঃপতিত মুসলমানরা আজ খোদার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত। আর এ জন্যই তারা সারা বিশ্বে অপমানিত আর লাঞ্ছিত হচ্ছে।

সমস্ত মুসলিম আজ শত দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার কারণে পরস্পরের মাঝেও ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছে। আর মুসলমানদের এই অনৈক্যের কারণেই ভ্রাতৃঘাতী দ্বন্দ সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়তে দ্বিধাবোধ করছে না। ইরান-ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়া ইত্যাদি দেশসমূহে যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে।

আমরা জানি, পৃথিবীতে যখনই আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আগত নবী রাসূলদের মিথ্যাবাদী, ভণ্ড প্রতিপন্ন করতে জাতি তৎপর হয় এবং বিরোধীতা কোন ক্রমেই নীচে নামে না, তখন কোন না কোন ঐশী আযাব অপরিহার্যক্রমে অবতীর্ণ হয়। আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে আযাব এজন্যই পাঠান যাতে তারা সত্যের দিকে আকর্ষিত হয় এবং কোন কোন সময় সম্পূর্ণ সীমাতিক্রম বশতঃ কোন কোন জাতি একেবারে ধ্বংস বা নিশ্চিহ্নও হয়। সম্প্রতি আমরা জাপানে ভূমিকম্প ও সুনামির তাণ্ডবলীলা প্রত্যক্ষ করেছি। নি:সন্দেহে আমরা বলতে পারি সমগ্র পৃথিবীতে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিচ্ছে তাও খোদা তাআলার পক্ষ থেকে যিনি এসেছেন তাঁকে অস্বীকার করার কারণেই হচ্ছে।

হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী মহান আল্লাহ্ তাআলা যথা সময়ে এ উম্মতের সংস্কারের জন্য হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ হিসেবে প্রেরণ করছেন। তাঁর মৃত্যুর পর সংস্কারের কার্যক্রমকে পরিচালনা করার জন্য সয়ং খোদা তাআলার ইচ্ছায় আহমদীয়া জামাতে খিলাফত ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে। সারা বিশ্বের প্রায় ২০০টি দেশের আহমদী সদস্যরা এক খলীফার নেতৃত্বে আছেন। যার ফলে তাদের মাঝে নেই কোন ঝগড়া-বিবাদ।

খিলাফত এমন এক ঐশী ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলার তৌহীদ প্রতিষ্ঠা হয়। খিলাফত ছাড়া প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌র একত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়া কখনো সম্ভব নয়। যেখানে খিলাফত নেই সেখানে তৌহীদ প্রতিষ্ঠা হতেই পারে না। একমাত্র খিলাফতের মাধ্যমেই সম্ভব তৌহীদ প্রতিষ্ঠা করা। কারণ পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা খিলাফতের ওয়াদার আয়াতে (সুরা নূরের ৫৬) এই সম্পর্কে বলেন, "ইয়া'বুদুনানি লা ইউশরিকুনা বি শাইআ" অর্থাৎ তারা আমার ইবাদত করবে এবং কোন বস্তুকে আমার সাথে শরীক করবে না।

এখানে আল্লাহ্ তাআলা এটাই স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যে, যারা খিলাফতের রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখবে তারা কোন দিন শিরক করবে না, তারা এক খোদার ইবাদতে নিমগ্ন থাকবে, তারা আল্লাহ্‌র তৌহীদ প্রতিষ্ঠাকারী হবে। আর যাদের মাঝে এই খিলাফত থাকবে না তারা আল্লাহ্‌র তৌহীদ থেকে দূরে সরে যাবে। যেমন আজ আমরা খিলাফতহীন দলগুলোর মাঝে দেখতে পাই নানা ধরনের শিরক। যা দেখে খুবই আফসোস হয়, হায়রে মুসলমান! কত উচ্চ শিক্ষা ইসলামের, আর আজ নেতৃত্বহীন থাকার ফলে কোন স্তরে নেমেছে। এক নেতার অধিনে না থাকার কারণে দেখা যায় কেউ পীরপূজায় লিপ্ত, কেউ বা কবর পূজায় লিপ্ত আবার কেউ আগুন পূজা, গাছ পূজাসহ নানা রকম শিরকে লিপ্ত।

বিভেদ বা সংঘাত নয়, সত্য প্রতিষ্ঠা এবং একক নেতৃত্বের অধীনে থেকে জীবন

অতিবাহিত করার শিক্ষাই পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বার বার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ইসলাম শান্তি ও ঐক্যের ধর্ম। ঐক্য প্রতিষ্ঠাই ইসলামের মূল লক্ষ্য। আর ঐক্য যদি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে মনে করতে হবে সব হয়ে গেছে।

ইসলামী খিলাফতের গুরুত্ব যে অপরিসীম এই ব্যাপারে সকল যুগের জ্ঞানী-গুনি, পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গরা তাদের মতামত পেশ করেছেন। সকলেই অকপটে শিকার করেছেন যে ঐক্য ছাড়া ইসলামের উন্নতি হতে পারে না। ইসলামের উন্নতির জন্য ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক আর এই ঐক্য প্রতিষ্ঠা কিভাবে হবে? তা হতে পারে একমাত্র ঐশী নেতৃত্বের অধিনে চলে জীবন অতিবাহিত করে। সমগ্র বিশ্বে একক নেতৃত্ব অর্থাৎ খিলাফতের যে প্রয়োজন রয়েছে তা কিন্তু সবাই কম বেশি উপলদ্ধি করতে পারছেন।

আজ সকলেই একটা বিষয় খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে পারছেন যে বর্তমানে ইসলাম সর্বত্রে যে মার খাচ্ছে এর প্রধান কারণ হচ্ছে ইসলামে আজ কোন ঐক্য নেই, নেই কোন একক নেতৃত্ব। সমগ্র বিশ্বকে পরিচালনা করার মত কোন ইসলামী নেতা বা খলীফা নেই। কিন্তু অনেক পূর্ব থেকেই ইসলামে একক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অনেকেই অনেক আন্দোলন চেষ্টা প্রচেষ্টা করেছে, বাংলাদেশেও খিলাফত আন্দোলন নামে সংগঠন আছে কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা প্রচেষ্টা ব্যর্থ সাব্যস্ত হয়েছে। কারণ খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা দুনিয়াবী মানুষের কাজ নয় এটা আল্লাহ্ তাআলার কাজ।

দেখা যায়, ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় পৃথকভাবে যে আরব-ঐক্য গড়ে ওঠেছিল, ইরাক-কুয়েত যুদ্ধে তা-ও নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষতঃ OIC-এর মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে যে অতি প্রয়োজনীয় একক নেতৃত্ব কিংবা নেতৃত্বের ঐক্য গড়ে উঠবার সম্ভাবনা অনেকেই দেখেছিলেন তা-ও ধূলায় লুণ্ঠিত হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আবারও নতুন করে দেখা দিয়েছে যে, কীভাবে মুসলিম ঐক্য গড়ে উঠবে, এই প্রশ্ন আজ সব মুসলমানেরই মনে তা সুন্নী হোক, শিয়া হোক, মাযহাবী, লা-মাযহাবী কিংবা ওয়াহাবী যে-ই হোক না কেন সবাই আজ উপলদ্ধি করছেন যে ইসলামে একক নেতৃত্বের খুব প্রয়োজন। দুনিয়াতে আজ এমন কোন দেশ নেই, এমন কোন জাতি নেই যারা বলবে না যে একক নেতার প্রয়োজন নেই।

ইসলামী একক নেতৃত্ব বা খিলাফত যে মানুষকে প্রকৃত সুখ-শান্তি দিতে পারে এই ব্যাপারেও সবাই আজ একমত। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবীদ অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ তার 'ইসলামী নেতৃত্ব' পুস্তকে বলেন, ''ইসলামী নেতৃত্ব (খিলাফত) মানুষের সুখ, শান্তি এবং কল্যাণের কথা ভেবে থাকেন। মানুষের দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ এবং আখিরাতের মুক্তির ব্যাপারেই তারা সর্বদা পেরেশান থাকেন। কল্যাণ ও মুক্তির পথে মানুষকে নিয়ে আসার জন্যই তাঁরা তৎপর। [অর্থাৎ খলীফারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা কাজ করেন] (ইসলামী নেতৃত্ব–পৃঃ ৭)।

তিনি আরো বলেন, "ইসলামী নেতৃত্বই (খিলাফত) মানুষের প্রকৃত কল্যাণকামী। দুর্ভাগা মানুষেরা এই মহাসত্যকে উপলব্ধি করতে পারে না। ফলে তারা তাদের কল্যাণকামীদেরকেই তাদের দুশমন মনে করে এবং তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু ইসলামী খলীফা এই দুর্ভাগাদের প্রতি দরদী এবং ক্ষমাশীল মন নিয়ে তাকান। দিনরাত তাদের কল্যাণের কথাই ভাবেন"। (প্রাগুক্ত পুস্তকের পৃঃ ৯)।

সূরা নূরের সপ্তম রুকুর আয়াত 'ইস্তেখলাকের' ব্যাখ্যায় ইমাম ফকরুদ্দীন রাজী তাঁর তফসীরে কবীরের জিলদ ৫, পৃঃ ৪২৯ এ লিখেছেন, "যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা হারুন, ইয়াশুয়া, দাউদ এবং সুলায়মানকে খলীফা করেছিলেন তদ্রূপ এই উম্মতেও তিনি খলীফা করবেন।'

আজ যদি সবাই কুরআনের শিক্ষা অনুযায়ী একক নেতৃত্বের অধিনে চলতো তাহলে অবশ্যই মুসলমানরা সর্বত্রে মার খেত না। যুগ খলীফার আহ্বানে লাব্বায়েক বলে যদি সাড়া দিত তাহলে মুসলিম বিশ্বের এই করুণ অবস্থা দেখতে হতো না।

ইসলাম আল্লাহর একমাত্র মনোনিত ধর্ম। তাই ইসলাম মানুষের মনে অসাধারণ গুণের ও মহত্বের উন্মেষ ঘটাবে এটাই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে বাস্তবে ঘটেও তাই আর ঘটেছেও তাই। স্বনিষ্ঠ ইসলাম অনুসারীদের মাঝে হতে দেখা গিয়েছে বহু অসাধারণ গুণের ও মহত্বের সমবেশ। একনিষ্ঠ ইসলামের অনুসারীরা হয়েছে সকল অসাধারণ মানবিক, নৈতিক ও মহৎ গুণের অধিকারী। এ জন্যই ইসলাম অনুসারী মুসলমানেরা সর্বক্ষেত্রে অতি আশ্চর্যজনক সাফল্য লাভ ও সুমহান কীর্তি স্থাপন করে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে এক অতি গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য। তাঁদের সে সাফল্য প্রকৃতই অতীব বিস্ময়কর। মুসলমানেরা হয়েছিল বিশ্বের অর্ধেকের মালিক। তাঁরা প্রবল প্রতাপ ও শান-শওকতের সঙ্গে শাসন করেছে অর্ধজাহান। শৌর্যবীর্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি প্রকৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁদের সাফল্য ছিল অতীব চমকপ্রদ। কোন ক্ষেত্রেই কোন জাতিই ছিল না তাঁদের সমকক্ষ।

মুসলমানেরা বিশ্বে সকল ক্ষেত্রেই ছিল শীর্ষস্থানীয়, নেতৃস্থানীয়। যুদ্ধ হতে শুরু করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জনে সক্ষম হওয়ায় তাঁদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বব্যাপী। সে যুগে মুসলমানেরাই দিয়েছিল বিশ্বনেতৃত্ব। অসাধারণ জাতিরূপে, শ্রেষ্ঠতম জাতিরূপে মুসলমানেরাই লাভ করেছিল প্রতিষ্ঠা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁদের সাফল্য ও খ্যাতি এতই অসাধারণ ছিল যে তাঁরা আখ্যায়িত হয়েছেন বহু আলংকারিক বিশ্লেষণে, প্রসংশিত হয়েছেন উচ্চসিত ভাবে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বড় বড় মনীষীগণ কর্তৃক।

বহু অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ায় মুসলমানেরা উন্নতির শীর্ষে পৌঁছেছিল সত্য, তবে একথা বলাই বাহুল্য যে পরবর্তীকালে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে আরও এগিয়ে যেতে, নিজেদের সে প্রতাপ, প্রতিপত্তি, প্রাধান্য ও বিশ্ব নেতৃত্ব বজায় রাখতে তাঁরা হয়েছিল ব্যর্থ। এর কারণ কি? শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে এবং অর্ধ জাহান শাসনের বিশ্বনেতৃত্ব যাদের গৌরবময় ঐতিহ্য, তা আজ কোথায় গেল? আজ এত এত মুসলমান দেশ থাকা সত্ত্বেও কেন পারছে না মুসলমান বিশ্বনেতৃত্ব দান করতে? এর একমাত্র কারণ হলো জাতির কোন নেতা নেই।

আজ যে ঐশী খিলাফতের ব্যবস্থাপনা চালু রয়েছে তা থেকে মানুষ দূরে বলেই মুসলমানরা সমগ্র বিশ্বে অপদস্থ হচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে যে ঐশী ইমাম পৃথিবীতে আছেন খোদা তাআলা করুন সবাই যেন তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে অবক্ষয় থেকে রক্ষা পান।

জ্বীনদের পরিচয়

আহমদিয়া মুসলিম জামা'তের চতুর্থ খলিফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রহ.) বিভিন্ন সময়ে জাতি, ধর্ম ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সব লোকদেরকে তার কাছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও বিষয়াদি উত্থাপনের সুযোগ দিতেন। ১৯৯৫ সালের নভেম্বরে লন্ডনে আরবী ভাষাভাষী লোকদের জন্য আয়োজিত তেমনি এক প্রশ্ন-উত্তর অনুষ্ঠানের একটি প্রশ্নের উত্তর মাসিক *রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স* পত্রিকার জানুয়ারি ২০০১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। অনুলিখন করেছিলেন আমাতুল হাদি আহমদ। বাংলা ভাষাভাষীদের সুবিধার্থে এটির বঙ্গানুবাদ এখন ছাপানো হচ্ছে। অনুবাদ করেছেন -মহিউদ্দিন অভি।

প্রশ্নঃ আমরা যদি ধরে নিই জ্বীন অন্যান্য প্রাণির মতোই একটি সৃষ্টি; যা কিনা পৃথিবীর কোনো এক স্থানে ভিন্ন কোনো মাত্রায় [ডাইমেনশনে] অবস্থান করে। তাহলে তো কোনো সমস্যাই থাকে না?

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.) ঃ

কোন সমস্যা তো নেই এবং জ্বীন কোন সমস্যা তৈরী করে না। সমস্যা হচ্ছে কেবল সেসকল লোকদের মনের মধ্যে যারা আন্যদের এটা বিশ্বাস করাতে পছন্দ করে যে তাদের 'জ্বীন' নামক কিছু প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব রয়েছে। এ ধরনের লোকেরা পরে 'জ্বীন' তাড়ানো ইত্যাদির নাম করে লোকদের কাছ থেকে অর্থ কামানোর পায়তারা করে। এ জায়গাতেই সমস্যা, তা না হলে 'জ্বীন' এমন সত্তা যারা মানুষের জীবনে বাগড়া দেয় না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা কেউ উত্থাপন করে না অথচ এর উত্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে যা শরীয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে তা হলো 'জ্বীন'রা নবী-রাসূলকে গ্রহণ করার ব্যাপারে কতখানি বাধ্য বা আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট। যদি 'জ্বীন'দেরকে কোন এক প্রকারের পৃথক প্রাণী হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, যদি তাদের একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে, তাহলে শরীয়া বা ধর্মীয় নীতিমালা অনুসারে তাদের কি অবস্থা হবে? যদি 'জ্বীন'দেরকে প্রকৃতিগতভাবে উদাহরণস্বরূপ ফেরেশ্‌তাদের অনুরূপ অশরীরী কোন সত্তা হিসেবে ধরে নেওয়া হয় তাহলে এই বিষয়টি অনেক পরিস্কার হয়ে যায়। আমরা অবশ্য জানিনা ফেরেশ্‌তারা দেখতে কী রকম। কিন্তু আমরা এটা জানি যে তারা রূপ ধারন করতে পারে এবং বিভিন্ন রূপে বিকশিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ফেরেশ্‌তাকে কখনো কখনো কবুতরের আকৃতিতে দেখা যেতে পারে যেভাবে হযরত ঈসা (আ.) দেখেছিলেন। হযরত রাসূল পাক (সা.) হযরত জীবরাঈল (আ.)-কে এক সময় এমন এক অস্তিত্ব হিসেবে দেখেছিলেন যা সমস্ত দিগন্ত জুড়ে ছিল আর তাঁকে এক সময় মানুষের রূপে দেখেছিলেন। এ থেকে এটা বুঝা যায় যে ফেরেশ্‌তাদের আমাদের মতো কোন শারিরীক আকৃতি বা অস্তিত্ব নেই। যদিও, তাদেরকে দৃশ্যমান হতে হলে কোন এক আকৃতি ধারণ করতে হয়। পবিত্র কুরআনে এরকম একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে উল্লেখ করে :

.....এবং সে তার সামনে এক সুস্থসবল মানুষের আকার ধারণ করলো। (সূরা মরিয়ম ১৯ : ১৮)

অর্থাৎ, যে ফেরেশ্‌তা হযরত মরিয়মের নিকট আবির্ভূত হলো সেটা তার নিজস্ব রূপ ছিল না-এটা ছিল এক সুগঠিত, সুদর্শন পুরুষ যাকে হযরত মরিয়ম দেখেছিলেন কিন্তু এটা কোন মানুষ ছিল না-এটা ছিল আল্লাহ্‌র এক ফেরেশ্‌তা। এভাবে, ফেরেশ্‌তাদেরকে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে হয় যখন তারা মানুষের সামনে আসে এমনকি হযরত ইবরাহীম (আ.) তাঁর কাছে আসা আল্লাহ্ তাআলার দূতদের সাধারণ মানুষ হিসেবে ভুল বুঝেছিলেন। তারা দেখতে এতখানি মানুষের মত ছিল যে হযরত ইবরাহীম (আ.) মেহমানদের জন্য একটি ছাগলছানা রান্না করার আদেশ দিয়েছিলেন। বিষয়টি হচ্ছে যে হযরত ইবরাহিম (আ.) তাঁর মেহমানদের প্রকৃত রূপ চিনতে ভুল করেছিলেন। আমি এখানে এটা বলতে চাচ্ছি না যে 'জ্বীন'রা ফেরেশ্‌তাদের অনুরূপ কোন অস্তিত্বের অধিকারী। যদিও, যতদূর জ্বীনরা কোন অশরীরী সত্তা ধারন করতে পারে, সেখানে এই দুইয়ের মাঝে প্রকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য থাকতে পারে। যেহেতু জ্বীনরা কোন বস্তুগত আকৃতি ধারণ করে না, তারা ফেরেশ্‌তাদের মতো কোন ছায়ারূপে আবির্ভূত হতে পারে এবং এরূপ তারা বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে 'জ্বীন' মুকাল্লাফ বিশারিয়া কিনা? অর্থাৎ, তারা কি ধর্মীয় নিয়মের অধীনে পড়ে কিনা? তাদের কি কোন একটি শরীয়া বা ধর্মীয় আইন গ্রহণ করতে হবে কিনা? কে সেই দাঈ-ইলাল্লাহ্ যে তাদের আল্লাহ্‌র দিকে ডাক দেয় এবং কিভাবে সেই বাণী তাদের নিকট পৌঁছায়? এটা কি বাতাসে 'ছড়িয়ে-ছিটিয়ে' থাকে যাতে করে 'জ্বীন' নামায এবং হজ্জ পালন করে? তারা কিভাবে যাকাত প্রদান করে? তারা কিভাবে বিয়ে করে এবং তাদের উত্তরাধিকারকে ছড়ায়? এ সব বিষয়ই শরীয়ার মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। একমাত্র যখন এসব বিষয় সামনে আসে, তখন এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে যদি 'জ্বীন'কে কোন অশরীরী অস্তিত্ব হিসেবে ধরা হয় তাহলে এটা হতে পারে না যে কোন মানুষ নবীকে মান্য করা তাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক আবশ্যকীয় করা হবে। এটা এজন্য যে একজন নবীকে হতে হবে তার নিজ প্রজাতির মধ্য হতে। ফেরেশ্‌তাদের ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন এই ধারণা বর্জন করে যে যখন মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয় তখন একজন ফেরেশ্‌তার নবী হিসেবে অবতরণ করা উচিত। তখন কিভাবে একজন মানুষ নবীকে কোন অশরীরী অস্তিত্বের কাছে প্রেরণ করা যাবে, যদি আমরা 'জ্বীন'কে সেরকম ধরে নেই? তাই যদি না হয়ে থাকে তবে কি কোন 'জ্বীন' নবী আছে? কিভাবে আল্লাহ্‌র বাণী তাদের নিকট ওহী হয়েছিল? আমরা কুরআন শরীফের কোথায় এটা পাই না যে আল্লাহ্ তাআলা কোন 'জ্বীন' এর নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন। আমরা দেখি যে আল্লাহ্ তাআলা এমনকি মৌমাছির নিকট ওহী করেন কিন্তু আমরা 'জ্বীন' সম্পর্কে এমন কিছুর উল্লেখ পবিত্র কুরআনে বা হাদীসে দেখতে পাই না।

যুক্তি-তর্কের এই ধারা একটি বিষয় খুব পরিষ্কারভাবে মিটিয়ে ফেলে এবং তা হচ্ছে কুরআন শরীফে যে 'জ্বীন'-এর উল্লেখ আছে যারা রাসূলে পাক (সা.)-কে গ্রহণ করেছিল তারা অশরীরী ধরনের 'জ্বীন' ছিল না, তারা এক ভিন্ন ধরণের সৃষ্টি হলে কোন ভাবেই একজন (মানুষ) নবী বা কোন শরীয়াকে অনুসরণ করার জন্য তাদেরকে আল্লাহ্ আদিষ্ট করবেন না। তাদের কোন শারিরীক রূপ নেই যার মাধ্যমে মানুষের নিকট মানবজাতির উদ্দেশ্যে এবং প্রয়োজনে প্রেরিত শরীয়াকে অনুসরণে তারা সক্ষম হবে। যদি 'জ্বীন' ভিন্ন ধরনের কোন সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তাদের শরীয়াও ভিন্ন হওয়া উচিত অন্যথায় কুরআন শরীফে যত নিয়ম কানুন উল্লেখিত আছে সেগুলো অশরীরী 'জ্বীন'-এর জন্য প্রযোজ্য হবে এবং এদের মাঝে আছে গোপনীয়তা, 'আসসালামু আলাইকুম'-এর মাধ্যমে এ মৌখিক সম্ভাষণ বিনিময়, বিয়ে, তালাক এবং উত্তরাধিকার সম্পর্কিত নিয়ম-কানুন, গুটি কয়েকের নাম নেওয়া হল মাত্র। তাই, যে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন তা হলো এই শরীয়া কি 'জ্বীন'দের জন্য প্রযোজ্য? যারা এই বিষয়ে গতানুগতিক ধারণা রাখে তারা তাদের বিশ্বাসের প্রয়োগকে বিভিন্ন অবস্থায় বিস্তৃত করার চেষ্টা করে না (তাহলে তারা স্পষ্ট অসংগতি অনুধাবন করতে পারত)।

আর অন্যান্য বিষয়বস্তু ছাড়াও আমি এটাকে অস্বীকার করি না যে কিছু অশরীরী সৃষ্টি থাকতে পারে যাদের নিজস্ব কাজ এবং উদ্দেশ্য রয়েছে।

তবে বাকী রইল তাদের বিষয়, এটি সম্পর্ণ ভিন্ন বিষয় যে সকল 'জ্বীন' রাসূলে পাক (সা.)-এর কাছে এসেছিল ও মুসলমান হয়েছিল, তারা পাহাড়ী গোত্রের লোক ছিল এবং তারা লোক সম্মুখে আসতে চায়নি। তারা লোকদের কাছে দেখা দিতে চায় নি এবং এজন্যই তারা রাসূলে পাক (সা.)-এর সাথে দেখা করার জন্য রাতের সময়টাতে বেছে নিয়েছিল।

[আমাদের দেশেও কোন কোন পাহাড়ী উপজাতি রয়েছে, যারা সভ্য লোকদের লোকালয়ে আসাটা পছন্দ করে না। (ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, পাক্ষীক আহমদী)]

লোকদের আনাগোনা হওয়ার আগেই চলে গিয়েছিল। তারা অবশ্যই মুকাল্লাফ বিশরীয়া ছিল অর্থাৎ তারা রাসূলে পাক (সা.)-এর আনীত বাণী গ্রহণের বা অর্জনের জন্য জবাবদিহী ছিল। যখন কোন নবী প্রেরিত হয় তাকে গ্রহণ করা তাদের জন্য জরুরী ও আবশ্যকীয় ছিল। তাই, তাদেরকে মানুষই হতে হবে।

'জ্বীন' শব্দটি মহাপুরুষ, আত্মগোপনকারী মানুষ রূক্ষ ও বিদ্রোহী গোত্রের লোক, পাহাড়ী মানুষদের জন্যও প্রযোজ্য এই সমস্ত ধরনের লোকদেরকে 'জ্বীন' বলে আখ্যায়িত করা যায়।

সংক্ষেপে, আমার দৃষ্টিভঙ্গী হচ্ছে এক বিশেষ ধরনের অস্তিত্বের পৃথকভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব, যেটা দেবদূত প্রতিম, না মানবীয় এবং এদেরকে 'জ্বীন' বলে আখ্যায়িত করা যায়। যাই হোক, কোন পবিত্র পুস্তকে এমন কোন সাক্ষ প্রমাণ নেই যে তাদের মধ্য থেকে নবী প্রেরণ করা হয়েছে অথবা কোন মানুষ নবীকে ঐ 'জ্বীন'-এর কাছে প্রেরণ করা হয়েছে তাদের বাণী পৌঁছানোর জন্য। কাজেই, শরীয়া তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে : '*হে জ্বীন ও মানুষের দল! তোমাদের কাছে কি তোমাদেরই মাঝ থেকে এমন সব রাসূল আসেনি যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করতো এবং তোমাদেরকে এ দিনের মুখোমুখি হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করতো? তারা বলবে আমরা আমাদের নিজেদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি।' আর পার্থিব জীবন তাদের প্রতারিত করেছিল। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেরাই এ কথার সাক্ষ্য দিবে, তারা নিশ্চয় কাফির ছিল।'*

(সূরা আনআম :১৩১)

যদিও এই আয়াতে মানুষের পাশাপাশি 'জ্বীন'দের উল্লেখ আছে, সৈয়দ হিলমি আল-শাফঈ সাহেবের [সেশনের মিশরীয় সহ উপস্থাপক] প্রস্তাবিত ব্যাখ্যাই যে একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তার পিছনে সুস্পষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে। তিনি বলেছেন যে এই আয়াত প্রকৃতপক্ষে এটার প্রমাণ যে, যে 'জ্বীন'দেরকে এখানে আহ্বান জানানো হয়েছে তারা মানুষ–তারা মানুষ ছাড়া আর অন্য কিছু নয়। কারণ কুরআন শরীফে এমন কোন দলিল নেই যে 'জ্বীন' এবং 'বাশার' (মানুষ)-এর জন্য পৃথক পৃথক নবী পাঠানো হয়। কুরআন শরীফে এমন কোন সাক্ষ্যপ্রমাণ নেই যে বিচার দিবসের দিনে 'জ্বীন' এবং বাশারকে পৃথকভাবে প্রশ্ন করা হবে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে আহ্বান ইয়া মাআশারাল জ্বীন (হে জ্বীনদের দল) এক ধরনের বা এক অংশের লোকদের করা হয়েছে–কিন্তু তারা মানুষই।

এটা আমাকে কুরআন শরীফের অনুরূপ কিছু আয়াত মনে করিয়ে দিল যেখানে যেসকল লোকদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তারা কোন অশরীরী অস্তিত্ব না, প্রকৃতপক্ষে তারা মানুষই। আমি কুরআন শরীফ থেকে আর একটি আয়াতের উদ্ধৃতি দিচ্ছি যা সূরা আর রাহমান থেকে নেয়া এই আয়াত একই ভাবে শুরু হয়েছে : '*হে জ্বীন ও ইসানের দল! আকাশসমূহের ও পৃথিবীর সীমানা অতিক্রম করার সামর্থ্য রাখলে অতিক্রম করে দেখাও। কিন্তু যথাযথ কর্তৃত্ব ছাড়া তোমরা অতিক্রম করতে পারবে না।'*

অতএব, (হে জ্বীন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

এখানে 'ইয়া মাশারাল জ্বীন-ঈ-ওয়াল ইন্‌স' (অর্থাৎ, হে জ্বীন ও মানুষের দল!) দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এই বিবৃতির অর্থ উপরে উদ্ধৃত উভয় আয়াতের জন্য এক। কুরআনের প্রয়োগ বিধি অনুসারে 'জ্বীন' শব্দটির অর্থ 'বুর্জোয়াশ্রেণী', 'সাম্রাজ্যবাদী' ক্ষমতা ও প্রভাবশালী লোক, প্রতিপতিশালী জাতিসমূহ বলে প্রমাণ করা যায় আর এর বিপরীতে 'ইনস' শব্দটির অর্থ 'প্রলেতারিয়াত শ্রেণী', সাধারণ লোক, জনগণ, 'সমাজতান্ত্রিক' জাতিসমূহ বলে ধরে নেওয়া যায় এবং এই দুইটি দলেরই দলনেতা রয়েছে। এই শতাব্দীতে যখন পৃথিবী 'সাম্রাজ্যবাদী' এবং গণ আন্দোলনের দুইটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গেল, তখন উভয় দলেরই তাদের নেতা আছে যারা তাদেরকে শাসন ও নিয়ন্ত্রণ করে। এই আহ্বান প্রকৃতপক্ষে যেমন ক্ষমতাশীল ও প্রভাবশালী লোকদের নেতাদের প্রতি করা হয়েছে তেমনি সাধারণ লোকদের নেতাদের প্রতিও করা হয়েছে–যেমন ধনী জাতিসমূহের নেতাদের প্রতি করা হয়েছে তেমনি দরিদ্র জাতিসমূহের নেতাদের প্রতি করা হয়েছে। কুরআন শরীফে এই আয়াতের (সূরা ৬, আয়াত ১৩১) মাধ্যমে এই দুই দলকেই স্মরণ করা হয়েছে যে তোমাদের সকলের প্রতি নবী প্রেরণ করা হয়েছে, তোমরা যে দলেরই অন্তর্ভুক্ত হও না কেন। আমি বিশ্বাস করি এই ব্যাখ্যা কেবল প্রযোজ্যই নয়, এই প্রেক্ষাপটে এটাই একমাত্র যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা।

এখন আমি উরোল্লিখিত অন্য আয়াতের (সূরা ৫৫, আয়াত ৫৪) প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা এখানে যথেষ্ট পরিষ্কার যে 'ইয়া মাশারাল জ্বীন এবং ইয়া মাশারাল ইন্‌স' মানবজাতির দু'টি দলের প্রতি ইঙ্গিত করে কারণ এখানে এটা বেশ পরিষ্কার যে এখানে এমন সময়ের উল্লেখ করা হয়েছে যখন মহাকাশ ও মহাশূন্যে সীমারেখার বাইরে যাওয়ার এবং অতিক্রম করার চিন্তা করা মানবজাতির পক্ষে সম্ভব হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই পদক্ষেপ মানবজাতির জন্য অসম্ভব হয়ে ছিল কুআনের এই চ্যালেঞ্জ অর্থহীন ছিল। সেজন্য, এটা ভবিষ্যতের জন্য এক চ্যালেঞ্জ ছিল। 'জ্বীন'দের সম্পর্কে এটা বলা সম্ভব হয়ে ছিল যে (যদি তাদেরকে কোন অপ্রাকৃতিক সৃষ্টি হিসেবে ধরে নেওয়া হয়) তারা সম্ভবত লাফ দিতে এবং নির্দিষ্ট সীমারেখা অতিক্রম করতে পারত কিন্তু খুব সম্প্রতিক সময় পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য উচ্চতা পর্যন্ত পৌঁছানো মানবজাতির পক্ষে সম্ভব ছিল না।

মানবজাতির পুরানো প্রজন্মের কাছে কি ছিল যা তারা এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারত? তাদের এই উদ্দেশ্যের জন্য কিছু ছিল না। প্রমাণ উড়োজাহাজ সে সময় ছিল না। এথেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে কুরআন এই চ্যালেঞ্জ পেশ করে যে যদি মানবজাতি সমগ্র মহাবিশ্বের পরিসীমার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে, আকতারিস-সামাওয়াত-এ-ওয়াল আর্দ, তো সে এটার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু সে খুব নিশ্চিতভাবে এই প্রচেষ্টায় বিফল হবে। এটা এইরূপ হবে কারণ যেভাবে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে: '*তোমাদের উভয়ের উপর অগ্নি-শিখা এবং গলিত তাম্র প্রেরণ করা হইবে, তখন তোমরা (উহা হইতে বাঁচার জন্য) একে অপরের সাহায্য করিতে পারিবে না।'* (সূরা ৫৫, আয়াত ৩৬)

অর্থাৎ, যদি তোমরা মহাবিশ্বের সীমার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করতে তাহলে আগুনের গোলা তোমাদের দিকে নিক্ষিপ্ত হত এবং তোমরা বাঁধা অতিক্রম করতে পারবে না।

এই দৃশ্যপট ভবিষ্যতের কোন এক যুগের দিকে ইঙ্গিত করে, এমন এক যুগের দিকে যখন মানবজাতি দু'টি প্রধান দলে বিভক্ত হবে, ক্ষমতা ও প্রভাববাদী লোক এবং জনগণের লোক–'প্রলেতারিয়াত' গোষ্ঠী এবং 'বুর্জোয়াগোত্রী' বা 'সমাজবাদী' এবং 'সাম্রাজ্যবাদী'। উভয় ধরণের দলই চাঁদে, মঙ্গলগ্রহে এবং আরও দূরে যাওয়ার চেষ্টা করবে। তারা মহাবিশ্বের সীমা অতিক্রম করার চেষ্টা করবে–এটাই ভবিষ্যদ্বাণী। কুরআন শরীফ 'আকতারুল আর্দ' এই শব্দগুলো ব্যবহার করেনি, যার অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর সীমারেখা কারণ এটা পৃথিবীর চারপাশের আকাশ খুব সীমিত ও ছোট জায়গা। অপরপক্ষে, পবিত কুরআনের চ্যালেঞ্জ পুরো বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কুরআন শরীফ উল্লেখ করেছে যে চূড়ান্ত পরিধি যা মহাবিশ্বের বাইরের সীমারেখা অতিক্রম করা মানবজাতির জন্য অসম্ভব। যে সময় পবিত্র

কুরআন প্রথম নাযেল হয়েছিল তখন না 'জ্বীন' না 'ইনস্' [সাধারণ লোক] এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা এই আয়াতের সত্যিকারের তাৎপর্য বুঝতে এবং সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারি কারণ এখন আমরা জানি মহাবিশ্বের প্রান্তে পৌঁছানোর জন্য আলোর গতিতে চললে মানুষের আঠারো থেকে বিশ বিলিয়ন বছরের মত সময় লেগে যাবে - [আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে ১৮৬ হাজার মাইল হবে –অনুবাদক]। সমস্যাটা আরো জটিলতর হয়ে উঠে যখন আমরা মহাবিশ্বের এক চির সম্প্রসারণশীল বিশ্ব হিসেবে গণনা করি। এই দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেন যে মহাবিশ্বকে ক্রমাগত বিস্তৃত করা হচ্ছে এবং ঠিক এটাই বিজ্ঞানীরা আমাদেরকে বলছেন, যে এটা একটি সম্প্রসারণশীল বিশ্ব। এটাই এই আয়াতের অর্থ (সূরা ৫৫, আয়াত ৩৪)। আসলে এটা একটা ভবিষ্যদ্বাণী, একটি মহান ভবিষ্যদ্বাণী, আসন্ন সময়, কৃত আবিষ্কার এবং মানুষের মাঝে সৃষ্টতব্য উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে। এমন একটি সময়ে মানজাতি বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা করবে এবং আল্লাহ্ উল্লেখ করে রেখেছেন যে তারা তাদের এই লক্ষ্যে সফল হবে না। এরূপ করা তাদের জন্য অসম্ভব হবে।

সংক্ষেপে এটা কল্পকাহিনীর সেই 'জ্বীন' নয় যার কথা কুরআন শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে (এটা যেভাবে উপরে উল্লেখিত হয়েছে, মহা প্রভাব এবং কতৃত্বের অধিকারী লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে)। আমরা এটা তথ্য প্রমাণ থেকে জানি তাহলে আমরা কেন আমাদের চোখের সামনে ইতোমধ্যে ঘটে যাওয়া ঘটনার বিপরীতে কুরআন শরীফের ব্যাখ্যা করতে যাবো। এটা একটা সত্য ব্যাপার যে, 'প্রলতারিয়াত শ্রেণী' এবং 'বুর্জোয়াগোত্র', সাম্যবাদী ব্লক এবং সাম্রাজ্যবাদী জাতি, উভয় দলই মহাশূন্যে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা করেছে।

জ্বীন শব্দটি এমন একটি ব্যাখ্যা যা প্রশস্ততর উপলব্ধিকে ধারণ করে এবং মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে অস্বীকার করে না, এরূপ ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে আমরা পবিত্র কুরআনের প্রতি অনেক বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে সক্ষম হই।

আমি এই প্রশ্নটি একটু বিশদভাবে আলোচনা করেছি যাতে করে সেসকল লোকদের উপদেশ দিতে পারি যারা 'জ্বীন'কে অতি প্রাকৃতিক সৃষ্টি হিসেবে বিশ্বাসের ব্যাপারে খুব বেশী জোর দেয়। এরূপ বিশ্বাস সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে কুরআন শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা করা এবং এরূপে করা যেন তা মানুষের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সাথে বৈপরিত্য সৃষ্টি না করে। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ আবিষ্কার কুরআন শরীফের সঠিক ব্যাখ্যাকে সমর্থন করে। আমি আমার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছি যা থেকে এটা স্পষ্ট যে আল্লাহ্ তাআলার অস্তিত্ব ও ইসলামের পবিত্র নবী (সা.)-এর প্রমাণস্বরূপ এই একটি আয়াতই উদ্ধৃত করা যথেষ্ট হতে পারে।

যারা জোর দেয় যে 'জ্বীন' শব্দটি কেবলমাত্র এমন সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য যারা মেয়েদেরকে "বশ" করে বা কারো মুরগী ধরে নিয়ে যায়, অথবা এমন কিছু যার সাহায্যে জাদুটোনার মাধ্যমে অন্য লোকের ভালবাসা অর্জন করতে ব্যবহার করা যায়, এ ধরণের লোকদের আমাদেরকে বলা উচিত কুরআন শরীফে কি এ সকল জিনিসের উল্লেখ রয়েছে এবং থাকলে কোথায়? উপরন্তু এরকম 'জ্বীন' যদি উদ্যোগ নিয়ে থাকে (মহাবিশ্বের পরিধি পার হওয়ার), তা আমরা কিভাবে জানি? কোন প্রকারেই পুরনো যুগের মানুষেরা এরূপ চেষ্টা করতে পারে না, কিন্তু যদি এই ধরণের 'জ্বীন'ও উদ্যোগ নিয়ে থাকে, আমরা তার সম্পর্কে জানি না। তাহলে কুরআন শরীফের সত্যতার জন্য সাক্ষ্য প্রমাণের বিষয়টি কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? অপরপক্ষে, আমার ব্যাখ্যা কুরআন শরীফের সত্যতার পক্ষে একটি পরিষ্কার যুক্তি উপস্থিত করে।

শুভ বিবাহ

* গত ১২-০৭-২০১০ তারিখে মোছা: শারমিন আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ মর্তুজ আলী, তারুয়া-এর সাথে মোহাম্মদ বাদল মোল্লা, পিতা-মৃত: ওয়ালী মোল্লা, তারুয়া-এর বিবাহ ১.০৫,০০০/- (এক লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৭৯/১০।

* গত ১৯-১১-২০১০ তারিখে মোছা: মিতু বেগম, পিতা-মৃত: মন্টু মিয়া, ঘাটুরা, বি, বাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ বাসার মিয়া, পিতা-মোহাম্মদ নিজন মিয়া, ঘাটুরা, বি, বাড়িয়া-এর বিবাহ ১,২০,০০০/- (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৮০/১১

* গত ০৮-০২-২০১১ তারিখ মোছা: রিফফাত জাহান জ্যোতি, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল করীম, তালশহর, আশুগঞ্জ, বি, বাড়িয়া-এর সাথে মোহাম্মদ আলমাস হোসেন খাঁন (রুমেল), পিতা-এ, কে, এম, নুরুল ইসলাম খাঁন হেলেঞ্চাকুড়ী, দশমাইল, দিনাজপুর-এর বিবাহ ১,০০০০১/- (একলক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৮১/১১

* গত ০৭-০২-২০১১ তারিখ মোছা: রুনা আক্তার, পিতা-জনাব লাল মিয়া, তারুয়া, বি, বাড়িয়া-এর সাথে শামীম আহমদ, পিতা-মৃত: মগল মিয়া, তারুয়া-এর বিবাহ ৬০, ০০০/- (ষাট হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।

বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৮২/১১

* গত ০৪-০২-২০১১ তারিখে মোছা: শাহানাজ পারভীন, পিতা-আ: রাজ্জাক মাষ্টার, চাঁদপুর-এর সাথে মোহাম্মদ মাসুদ আবেদীন খাঁন, পিতা-মৃত: ডা: মোহাম্মদ এম. জয়নাল আবেদীন খান, আজিমপুর, ঢাকা- এর বিবাহ ১,০০০০১/- (এক লক্ষ এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৮৩/১১

* গত ১০-০১-২০১১ তারিখে মোছা: মেরীনা আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ফুলতলা, পঞ্চগড়- এর সাথে দিলোয়ার হোসেন, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল খালেক চৌধুরী, হবিগঞ্জ-এর বিবাহ ৮০,০০০/- (আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৮৪/১১

* গত ০৮-০২-২০১১ তারিখে মোছা: পারুল আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ আলী, কমলাপুর, নোয়াখালী-এর সাথে আহমদ মাজহারুল হক, পিতা-আলহাজ্জ মোহাম্মদ ফজলুল হক, তেজগাঁও, ঢাকা-এর বিবাহ ১,৫০,০০১/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৮৫/১১

* গত ২৩-১১-২০১০ তারিখে মোছা: মোর্শেদা আখতার, পিতা-মোহাম্মদ ফালু মিয়া, শালশিড়ি-এর সাথে মোহাম্মদ সোহেল রানা পিন্টু, পিতা-মৃত: সৈয়দ আলী মন্ডল, নিউসোনাতলা-এর বিবাহ ৭২,০০০/- (বাহাত্তর হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৮৬/১১

* গত ১৯-০৬-২০০৯ তারিখে মোছা: সীমা বেগম, পিতা-মোহাম্মদ আবুল খায়ের, তারুয়া, বি, বাড়িয়া-এর সাথে তপন আহমদ, পিতা-মোহাম্মদ আব্দুল জলিল তারুয়া, বি, বাড়িয়া-এর বিবাহ ১,৫০,০০১/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার এক) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৮৭/১১

* গত ০৮-০১-২০০১০ তারিখে মোছা: মৌসুমী আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ জমসেদ আলী, নাটোর-এর সাথে গোলাম রব্বানী ভূঞা, মৃত: সামসুল হক ভূঞা, কুমিল্লা-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/- (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৮৮/১১

* গত ২৪-০৮-২০০৮ তারিখে মোছা: লাভলী আক্তার, পিতা-মোহাম্মদ মিলন মিয়া, কিশোরগঞ্জ-এর সাথে আহসান উল্লাহ্ সিকদার, পিতা-আশরাফ উল্লাহ্ সিকদার (পিয়েল) ১,৪০,০০০/- (এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৮৯/১১

* গত ১১-০২-২০১১ তারিখে মোছা: তাহেরা মজিদ, পিতা-আব্দুল মজিদ, চকবাজার, চট্টগ্রাম-এর সাথে মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, পিতা-মোহাম্মদ নায়েব আলী ভূইয়া, হোসনাবাদ-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৯০/১১

গত ২৫-০২-২০১১ তারিখে মোছা: শারমিন আক্তার রুমা, পিতা-এস, এম, ফতেহ আলী, বাড়ান্তিপাড়া, যশোর-এর সাথে মাহমুদ আহমদ জুয়েল, পিতা-মোহাম্মদ জালাল আহমদ, দারুত তবলীগ, ঢাকা-এর বিবাহ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। বিয়ের রেজিষ্ট্রেশন নং-৮৯১/১১

‘সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট’ ১৯ ডিসেম্বর, ২০১০ অনুষ্ঠিত

সুধি পাঠক! আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন, হুযূর (আই.) এর নির্দেশক্রমে এখন হতে ‘সত্যের সন্ধানে ডাইজেস্ট’ নামে পাক্ষিক আহমদী-তে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হবে, যারা অপারগতায় অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন না বা দেখতে পারেন নি তারা এ অধ্যায় হতে অবশ্যই উপকৃত হবেন। কিন্তু সত্যের সন্ধানে অনুষ্ঠানের প্রকৃত স্বাদ পেতে হলে অনুষ্ঠান দেখার বিকল্প নেই। অ-আহমদী বন্ধুদের নিয়ে অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমেই এ অনুষ্ঠান সর্বাধিক সফল হতে পারে।

-মোহাম্মদ সোলায়মান, মুবাশ্বের মুরব্বী

বিঃ দ্রঃ এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত প্রশ্নোত্তর সরাসরি সম্প্রচারিত ‘সত্যের সন্ধানে’ অনুষ্ঠান হতে কাট ছাঁট ও সংক্ষেপ করে পাঠকের পিপাসা নিবারনের জন্য পেশ করা হয়েছে।
বিস্তারিত উত্তর শুনতে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখুন বা আমাদের www.ahmadiyyabangla.org ওয়েব সাইট ভিজিট করুন।

প্রশ্নঃ হোসনে আরা, নিউইয়র্কঃ আমরা চাঁদা দেই, আর অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের চাঁদা দিতে হয় এবং যখন দেই এই চাঁদা গুলো ঠিকমত প্রযোজ্য হচ্ছে কিনা তারা জানতে চান, কিভাবে এটা খরচ হয়, এই বিষয়ে যদি কিছু বলেন।

মওলানা ফিরোজ আলমঃ এটি কুরআন শরীফের অতি সূচনাতেই আল্লাহ তাআলা বলেছেন সূরা বাকারা আপনি পড়েন ৪ বা ৫ আয়াত আছে যে, মু'মিন তারা যারা আমরা তাদেরকে যেই রিযিক অর্থ দিয়েছি যে সম্পদ দিয়েছি, সেই সম্পদ থেকে তারা খোদা তালার পথে খরচ করে। তো এই ধরনের আয়াত কুরআনের বহু স্থান আছে। সূরা বাকারাতে পর পর বেশ কয়েকবার এসেছে। সূরা আল ইমরানে আছে, কুরআনের অগণিত স্থানে আপনি আর্থিক কুরবানী কথা দেখবেন এবং অন্য এক জায়গায় আছে-**‘ইন্নাল্লাহা ইসতারা মিনাল মু'মিনীন আনফুসা ওয়া আম ওয়ালাহুম বে আন্না লাহুমুল জান্নাহ’**। অর্থ-যে আল্লাহ্ তাআলা মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ এবং সম্পদ ক্রয় করে দিয়েছেন কেননা তাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি আছে। আর্থিক কুরবানী করা সত্যের জন্য, সত্যের প্রচারের জন্য এটি খোদা তাআলার নির্দেশ।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা যেহেতু আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এসেছেন। তাই তিনি কুরআনের এই আয়াতগুলোকে বাদ দিয়ে তার সফর এবং যা অব্যহত রাখতে পারেন না। তাহলে তিনি সত্যবাদী হবেন না। আজও যারা এই সত্য গ্রহণ করবে তাদেরকে আর্থিক কুরবানী করতেই হবে। কেননা পৃথিবীতে ইসলাম প্রচারের জন্য অর্থের প্রয়োজন মসজিদ নির্মাণের জন্য অর্থের প্রয়োজন, কুরআন করীম ছাপার জন্য অর্থের প্রয়োজন, কুরআনের তফসির ছাপার জন্য অর্থের প্রয়োজন। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ বসবাস করছে তাদের মাঝে সত্য প্রচার করতে গেলে কর্মী বাহিনী প্রয়োজন। সেই কর্মী বাহিনীর জন্য অর্থের প্রয়োজন। বড় কথা হল যে এই অর্থ যা প্রত্যেক আহমদী তাদের ঘাম ঝরিয়ে যে আয় করে সেই আয়ের ভিত্তিতে তারা আয়ের একটা অংশ ১৬ ভাগের ১ ভাগ বা তারও বেশী ১০ ভাগের ১ ভাগ বা ৩ ভাগের ১ ভাগ পর্যন্ত অনেকেই আল্লাহ্ তাআলার পথে খরচ করছে। এই চাঁদার নিগরানী এবং তত্বাবধানের জন্য আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে লোক নিযুক্ত আছে। এর তত্বাবধান করছে স্বয়ং আল্লাহ্র খলীফা এবং খলীফাই দেখা শুনা করেন বায়তুল মালের। তাই কোন ক্ষেত্রে যদি কোন প্রকারের ভুল ক্রটি হয়। এটি আল্লাহ্র খলীফা নিজে দেখবেন। আমরা সাধারণ সদস্য হিসাবে আমাদের জন্য খোদার নির্দেশ হল তুমি খোদা তাআলার পথে তুমি যা আয় কর তার একটা অংশ দিয়ে দিবে বাকি খলীফা কোন খাতে কিভাবে সেটা খরচ করবেন।

কোথাও যখন ভুমিকম্প হচ্ছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভূমিকম্প কবলিত মানুষের জন্য প্রেরণ করছেন। বাংলাদেশে ঘুর্ণিঝড় দেখছিলেন সেখানে পাঠান, আইলাতে প্রভাবিত মানুষের জন্য পাঠান। আমরা যেহেতু কেন্দ্রে কাজ করি আমরা জানি যে আল্লাহ্ তাআলার ফজলে এক একটি পয়সা সঠিক খাতে ব্যবহার হচ্ছে এবং সঠিক বিশ্লেষণের পর খলীফাতুল মসীহ সেই গুলোকে চ্যানেলাইজড করেন। তাই এ ব্যাপারে আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনার এবং আমার কাজ হলো খোদার নির্দেশকে মানা যে আল্লাহ্ তাআলার পথে আর্থিক কুরবানী কর। বাকী নিগরানী খলীফাতুল মসীহ করছেন।

প্রশ্নঃ মিজানুর রহমান, লন্ডনঃ কোন আয়াতে কোন পৃষ্ঠায় সুস্পষ্টভাবে বলা আছে ইমাম মাহদী (আ.) যে আসবেন। উনার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার কি নির্দেশ যে উনাকে আমাদের মানতে হবে এবং উনার কাছে বয়আত নিতে হবে। আসলে এই মানা এবং বয়আত নেয়া বলতে কি বুঝায়?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ কুরআন শরীফে সূরা আলে ইমরানের ৮২ নম্বও আয়াতে লেখা আছে

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ
وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ
لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ
عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا
وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ٨٢

এখন সমস্ত নবীদের কাছ থেকে যদি কোন জিনিসের অঙ্গীকার নেয়া হয় তাহলে কি নবীকুল সর্দার নবী কুল শিরমনী হযরত মুহাম্মদ (সা.) নবীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নন? অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত এই কথাটাই সূরা আহযাবের ৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা বলছেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ
وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٨

অর্থাৎ এবং স্মরণ কর যখন আমরা সমস্ত নবীদের কাছ থেকে তাদের দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম। এবং তোমার নিকট থেকেও হে মুহাম্মদ (সা.)। অতএব, হুযূর (সা.)-এর পর সত্যায়ন কারী এক উম্মতি নবী এক উম্মতি রাসূলের আসার কথা পরিস্কারভাবে কুরআন দ্বারা প্রমাণিত। সূরা জুমুআর ভিতর **‘ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়ালহাকু বিহীম’** আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আধ্যাত্মিক ২য় আগমনের কথা বলেছেন। এর ব্যাখ্যা যখন রাসূল করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাস করা হয়েছিল, তিনবার প্রশ্ন করার পর রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত সালমান পার্শী (রা.)-এর কাঁধের উপর হাত রেখে বলেছিলেন, **‘লাউ কানাল ঈমান ইনদাস সুরাইয়্যা লানা লাহু রাজুলুন আউ রিযালুম মিন হাউলায়ে’**। ঈমান-শূন্য যুগে এদের মধ্য থেকে একজন বা একাধিক জন এসে সেই ঈমানকে উদ্ধার করবেন। আপনাকে আল্লাহ তাআলা সঠিক পথ দেখার এবং পালন করার সৌভাগ্য দান করুন।

প্রশ্নঃ রিয়াজুল ইসলাম, পঞ্চগড়ঃ কুরআন শরীফে সূরা আল মায়েদায় ৩ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে যে আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করলাম তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জীবন ব্যবস্থা হিসাবে মনোনীত করলাম। এছাড়া হযরত মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন হাদীস শরীফে এসেছে আমি সবার শেষে আগমনকারী আমার পর আর কোন নবী আসবে না। এই বিষয়টি আমাকে খুলে বলবেন।

মওলানা ফিরোজ আলমঃ দ্বীন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, নেয়ামত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। কারো আসার দরকার কি? এটি হল আপনার প্রশ্ন। আর হাদীস শুনিয়েছেন যে আর কোন নবী আসতে পারে না। তো এ প্রসঙ্গে প্রথম কথা হলো শরীয়ত পরিপূর্ণ হয়েছে আপনার এ কথার সমর্থনে একটা হদীসও আছে, নবুয়তরূপি একটা গৃহ নির্মীত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) সেই গৃহের শেষ ইট। বলা হলো, এই গৃহটি কত সুন্দর কিন্তু কোনার একটা ইট

এখনও লাগানো হয়নি এই ইটটা যদি লাগানো হতো কত সুন্দর দেখাত। হযরত রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আমি হলাম সেই ইট। কিন্তু ভাই আপনি নিজে বলুন একটা প্রাসাদ নির্মিত হওয়ার পর প্রাসাদের কি আর রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়না? প্রাসাদকে কি পরিস্কার করার জন্য ঝাড়ার জন্য করো প্রয়োজন নাই। এই যে বাস্তব সত্য এটা কি আপনি উপেক্ষা করতে পারেন। কাল ধর্মকেও প্রভাবিত করে কাল সত্যকেও প্রভাবিত করে। স্বয়ং হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন ইহুদী ৭২ ভাগে বিভক্ত হয়েছে আমার উম্মত ৭৩ভাগে বিভিক্ত হবে। এমন যুগের জন্য মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন উম্মতের ভিতর মাহ্‌দী আসবেন। তিনি এসে সেই উম্মতের সংস্কারের কাজ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) স্বয়ং তাকে ঈসা ইবনে মরীয়ম নাম দিয়েছেন এবং নবীউল্লাহ বলেছেন। মুসলিম শরীফের হাদীসে ৪ বার তাঁকে নবী বলা হয়েছে। মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ যাকে নবী বলেছেন আমরা কারা এই শব্দ হাদীস থেকে বের করে দেয়ার।

আপনি হাদীস শুনিয়েছেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর পরে আর কোন নবী নাই। হযরত আয়েশা কি এই হাদীসের অর্থ জানতেন না। তিনি বলেন, কুলু ইন্নাহু খাতামান নবীঈন ওয়ালা তাকুলু লা নবীয়া বা'দাহু। হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে খাতামান নবীঈন অবশ্যই বল কিন্তু একথা বলবে না, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর পর আর কোন প্রকারের নবী নেই। আর একথা শুধু আমরা বলছিনা। উম্মতের সম্মানিত বড়বড় বুযুর্গরা লিখেছেন, হযরত মহী উদ্দিন ইবনে আরাবি এর অর্থ করেছেন, হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পরে নতুন শরীয়ত নিয়ে কেউ আসবেন না। কিন্তু মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ এর ধর্মের অধীনে তার ধর্মের সেবার জন্য উম্মতি নবী আসতে পারে। সূরা নিসার ৭০ আয়াতে আছে, আল্লাহ্ এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনুগত্য করলে নবীদের, সিদ্দীকদের, শহীদদের এবং সালেহদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এই আয়াত ভালভাবে পড়ুন যদি কোন পুরস্কার না পাওয়া যায় তাহলে উম্মতে মুহাম্মদীয়াতে কোন প্রকারের পুরস্কারের দ্বারই খোলা নেই।

প্রশ্নঃ কালু ভুঞা, চাদপুর বাংলাদেশঃ আহমদীরা সুন্নি ইমামের পিছনে কেন নামায পড়ে না। এর মুল পার্থক্য বা মুল কারণটা কী? আহমদী লোক মারা গেলে কেন সুন্নী মুসলমান মাটি দিতে পারে না?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) স্পষ্টভাবে বলে গেছেন, যখন কোন মুসলমান ব্যক্তি তার ভাইকে কাফের বলে ঘোষণা দেয় কাফের আখ্যায়িত করে সে নিজেই কুফরী করে। এই কাফের ঘোষণা তার বিরুদ্ধেই বর্তায়। আমরা কাউকে কাফের বলি না। আমরা শুধু বলি, ভাই মুসলমানদের তুমি কাফের বলার স্পর্ধা দেখিয়েছ তুমি আমার ইমাম হতে পার না। রাসূলে করীম (সা.)-এর এই সিদ্ধান্ত আমাদেরকে বাধ্য করছে যে আহমদীয়া জামাতকে দলগতভাবে যারা দলের নেতা হিসাবে কাফের বলে তাদের কারোও পিছনে আমরা নামায আদায় করি না। যে ব্যক্তি নিরবতা পালন করে সে-ও একই ফতোয়ার অধীনেই আছে। এমন কোন ইমাম আমাদের ইমাম না, যে মুসলমানদেরকে কাফের ঘোষণা দেয়।

জানাযার ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি অবশ্যই আহমদীদের মাটি দিতে পারবেন কিন্তু আহমদীদের জানাযা আহমদীরা পড়াবে। আপনি এই জানাযাতে শামিল হতে পারবেন। যদি বলেন, আমি আহমদীর অধীনে জানাযাটা পড়বা না। আপনি নিজে আকুতি জানিয়ে এর জন্য আলাদাভাবে জানাযা পড়তে পারেন। আপনি মাটি দেয়ার ব্যাপারেও অংশ গ্রহণ করতে পারেন, আপনি দোয়াতে অংশ গ্রহণ করতে পারেন। মৃতের জন্য আপনি আল্লাহ্‌র কাছে সারা জীবন দোয়া করতে পারেন কোন সমস্যা নাই।

প্রশ্নঃ ইমরান আহমেদ, ঢাকাঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্বন্ধে কুরআন, বাইবেল ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে তাঁর আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী আছে এবং তা পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এমন কোন ভবিষ্যদ্বাণী আছে কি যা তার বিপক্ষে যায় বা ভবিষ্যদ্বণী মিথ্যা? আহমদী, আহমদীয়াত ও আহমেদ এই শব্দ তিনটির বাংলা অর্থ কি?

মওলানা ফিরোজ আলমঃ হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) সম্পর্কিত সঠিক এবং সত্য ভবিষ্যদ্বাণী পূর্বের সকল ঐশী গ্রন্থে আছে। সেই সত্য ভবিষ্যদ্বাণী সবই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। পূর্বের ঐশী গ্রন্থে পরবর্তীতে যদি কোন পরিবর্তন আসে যেইগুলো সত্য বিবর্জিত সেইগুলো পুর্ণ হবে না।

হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর দ্বিতীয় নাম হল আহমদ। সেই নাম অনুসারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নাম করণ করা হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) নামের দ্বিতীয় অংশ অনুসারে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের নাম রেখেছেন আহমদীয়া মুসলিম ফিরকা ও জামা'ত। সংক্ষেপে মানুষ আমাদেরকে আহমদী বলে থাকে। আর 'আহমদ' শব্দের অর্থ হল সবচেয়ে বেশী প্রশংসাকারী। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সবচেয়ে বেশি প্রশংসাকারী জামা'ত। এই জামা'ত পৃথিবীতে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর প্রশংসার কাজ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রশ্নঃ চৌধুরী জাভেদ, ইটালীঃ বাংলাদেশে এখনও এমন কি শিক্ষিত সমাজেও বিয়েতে কোন বিধবাকে বর বা কনে বরণের অনুষ্ঠান হতে দূরে রাখা হয়। এটাতো মানুষকে ঘৃণার শামিল। এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা কি?

মওলানা ফিরোজ আলমঃ বিধবাকে অনুষ্ঠানাদি থেকে দূরে রাখা এটি মুসলমান সমাজে বা ইসলামের শিক্ষার অংশ হতে পারে না। আহমদীয়া মুসলিম জামাত এটিতে বিশ্বাস করে না। তাদের অন্য সবার মত সমাজের সকল সুস্থ কাজে কর্ম বিনোদনে অংশ নেয়ার সমান অধিকার আছে। হ্যাঁ যখন কোন মহিলা বিধবা হয় তার জন্য শরীয়তের সুনির্দিষ্ট শিক্ষা আছে। ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করতে হয় সেই সময় তার বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ বা সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়।

প্রশ্নঃ নাযমুল আহমদ, সৌদি আরবঃ আহমদীদেরকে কি হজ্জ করতে বা উমরাহ করতে আসতে দেওয়া হয়?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ আহমদীরা হজ্জ করতে পারে। এবছরও বাংলাদেশ থেকে ৩ জন হজ্জ করে ফিরেছেন, আল্লাহ্‌র ফজলে আমেরিকা থেকে ২৬ জনের মত হজ্জে গিয়েছেন। যে সমস্ত দেশে আইনগত কোন বিধি নিষেধ নাই সেখান থেকে আহমদীরা তাদের ইসলামী শর্ত অনুযায়ী হজ্জ পালন করতে যান। আর যে সমস্ত দেশে বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী তারা হজ্জ পালন করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়। আমাদের অনেকের নিয়ত আছে যখনই শর্ত পূর্ণ হবে আমরা হজ্জে যাব, ইনশাআল্লাহ্। আমরা দোয়া করি আমরা যেন যুগ খলীফার অধীনে কাফেলার সদস্য হিসাবে হজ্জ ব্রত পালন করতে পারি।

প্রশ্নঃ শহীদুল ইসলাম, রাজশাহীঃ ঈসা (আ.) মৃত্যু সম্পর্কে জানতে চাই।

মওলানা ফিরোজ আলমঃ কুরআন শরীফের ৩০টি'র মতো আয়াত আছে যাতে হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা পরিস্কারভাবে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা সূরা আলে ইমরানের ১৪৫ নম্বর আয়াতে বলেন, হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল ছাড়া কিছু নন তার পূর্বের সব রাসুল গত হয়ে গেছেন। তো প্রশ্ন হলো হযরত ঈসা (আ.) কি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর পূর্বের ছিলেন না? এটি হল এর সংক্ষিপ্ত উত্তর আরও ২৯টি আয়াত আছে।

প্রশ্নঃ বয়আত কেন করতে হবে?

মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরীঃ বয়আত অবশ্যই করতে হবে, কেননা হুযূর (সা.) বলেছেন, **'ফা ইযা রাআইতুমুহু ফা বায়ে'হু ওয়ালাও হাবওয়ান আলাস্‌সালযে ফা ইন্নাহু খালীফাতুল্লাহিল মাহদী'**। যখন তোমরা ইমাম মাহদী (আ.)-এর সন্ধান পাবে তখন গিয়ে তার হাতে বয়আত করবে। বয়আত কেন করতে হবে? **'ফা ইন্নাহু খলীফাতুল্লাহিল মাহাদিয়ু'** কেননা তিনি আল্লাহ্‌র খলীফা আল মাহদী। তিনি জগতের পক্ষ থেকে সার্টিফিকেট ধারী হবেন না বরং আল্লাহ্ তাকে পাঠাবেন। এই খানে এসে আমরা আদিষ্ট হয়েছি। আমরা সবাই আদেশ পালন করতে বাধ্য হয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন তোমাদেরকে ইমাম মাহদী (আ.)-এর হাতে এক হতে হবে এই জন্য বয়আত করাটা আবশ্যক।

প্রশ্নঃ শরীফ আহমদ আফ্রাদ, রঘুনাথপুরঃ আহমদী ও সুন্নীদের মধ্যে পার্থক্য কি?

মওলানা ফিরোজ আলমঃ আহমদী এবং সুন্নীদের ভিতর মৌলিক কোন পার্থক্য নেই, সুন্নিরাও পাঁচ বেলা নামায পরে। আমরাও পাঁচবেলা নামায পড়ি। আমাদের কালেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'**। আর অন্যরাও একই কলেমা পড়ে। আমরা হজ্জ করি। আমরা যাকাত দেই। আমরা রমযান মাসে রোযা রাখি। আল্লাহ্ তাআলার ফজলে ইসলামের মৌলিক বিষয়ে সুন্নিদের সাথে আমাদের বিন্দুমাত্র তফাত নেই। পার্থক্য শুধু এখানেই যে, আমরা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-কে গ্রহণ করেছি। আমাদের ভাইয়েরা এখনও গ্রহণ করেন নি, অপেক্ষায় আছেন। এটাই হল মুল পার্থক্য।

সংবাদ

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২২ এপ্রিল ২০১১ রোজ শুক্রবার বেলা ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মসজিদে বাইতুল ওয়াহেদে অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত মহতী জলসায় সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোবাশ্ শের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। উক্ত জলসায় তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব তৌফিক সরকার ও জনাব এস, এম সামী। 'হযরত মহানবী (সা.)-এর মানব প্রেম' এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ব বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। অত:পর মোহতরম সভাপতি সাহেবের জ্ঞানগর্ব ভাষণের মাধ্যমে জলসার ১ম পর্বের সমাপ্তী হয়। তারপর উক্ত মহতী জলসার ২য় পর্ব (প্রশ্নত্তোর) অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত জেরে তবলীগ ভাই বোনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মোহতরম ন্যাশনাল আমীর ও মোহতরম মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। উক্ত অনুষ্ঠানে মোট ১০৭৫ জন সদস্য সদস্যা, ১৬০ জন জেরে তবলীগ উপস্থিত ছিলেন। যার মধ্যে ১৫ জন ভ্রাতা ভগ্নী বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে দাখিল হন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল সদস্য সদস্যাকে খাবার প্রদান করা হয়।

মোস্তাক আহমদ খন্দকার

আজিমপুর হালকায় সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ৯ এপ্রিল ২০১১ তারিখ রোজ শনিবার বিকাল ৪টায় মজলিস আনসারুল্লাহ্ ঢাকা'র আজিমপুর হালকার উদ্যোগে আজিমপুর দায়েরা শরীফের 'আমাদের পাঠচক্র' সংগঠন প্রাঙ্গনে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সুন্দর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত, যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকা। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব সারোয়ার হোসেন দুলাল। এরপর আমাদের পাঠ চক্রের সভাপতি জনাব এস, জি কিবরিয়া (দিপু) হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন গুণাবলীর উপর সূক্ষ্ম দিকগুলো নিয়ে বক্তৃতা করেন। এরপর মওলানা আকরামুল ইসলাম 'ইসলামে নারীর অধিকার' বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেন যা সকলকে মুগ্ধ করে।

অত:পর আমাদের পাঠ চক্রের জনাব সৈয়দ ওসমান গনি ও জনাব মাহবুবুর রহমান বক্তৃতা করেন। এরপর মওলনা শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, 'ইসলামে মানবাধিকার' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। পরিশেষে সভাপতির ভাষণ দেন যয়ীমে আলা জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত। সবশেষে মওলানা আব্দুল আযীয সাদেক মুরুব্বী সিলসিলা (অব:)-এর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠানে ১০ জন জেরে তবলীগসহ ৩১ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।

সালাউদ্দিন মাহমুদ

কটিয়াদী জামা'তে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/০২/২০১১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কটিয়াদীর উদ্যোগে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন আসিফ আহমদ ও নযম পাঠ করেন সাদিফ আহমদ। বক্তৃতা পর্বে হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর জীবনাদর্শ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল হামিদ ভুইয়া, জনাব মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এবং জনাব মোহাম্মদ রূহুল আমীন। শেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে উক্ত জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ৪৫ জন।

বৈরাগীরচর হালকায় সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৭/০৩/২০১১ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত কটিয়াদীর হালকা বৈরাগীর চরে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন কটিয়াদী জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান। শুরুতেই পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মামুন। বক্তব্য রাখেন জনাব মোহাম্মদ রূহুল আমীন, মৌ. মোহাম্মদ বশির আহমদ এবং কটিয়াদী জামা'তের প্রেসিডেন্ট। দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ২৮ জন।

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান

ঘাটুরা জামাতে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরা গত ১২/০৩/২০১১ রোজ শনিবার বাদ মাগরিব জনাব হাফিজ মিয়ার বাড়ীতে সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জলসায় সভাপতিত্ব করেন জনাব এস, এম, ইব্রাহীম। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব উজ্জ্বল আহমদ। উর্দু নযম পাঠ করেন জনাব এস, এম আরমান। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সীরাত বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন পর্যায়ক্রমে জনাব মোহাম্মদ মুসা মিয়া, জনাব এস এম, হাবীবউল্লাহ্ মৌ. এনামুল হক রনি। সবশেষে সভাপতির সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্ত হয়। উক্ত তরবিয়তী সভায় মোট ৫০ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবুর রহমান লস্কর

ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় নও মোবাঈন জলসা-২০১১ অনুষ্ঠিত

গত ১৬/০৪/ ২০১১ রোজ শনিবার আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার মসজিদ বাইতুল ওয়াহেদে আঞ্চলিক নও মোবাঈন জলসা ২০১১ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মহতী জলসায় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহতরম মোহাম্মদ মঞ্জুর হুসেন, আমীর, আহমদীয়া মসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। উক্ত মহতী জলসা ২টি অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে ১ম অধিবেশনটি নও মোবাঈন সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম হামিদুল হক (নও মোবাঈন)। তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম উর্দু পাঠ করেন যথাক্রমে জনাব রফিকুল ইসলাম ও জনাব রেজা সাওরী খান। বক্তব্য পর্বে দোয়ার কবুলিয়ত এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব শামসুদোহা তুহিত, আহমদীয়াত একটি যৌক্তিক মতবাদ এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব রেজা সাওরী খান। 'ইসলামে নারীর মর্যাদা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব ইব্রাহীম খলিল বাবুল, আহমদীয়া খিলাফতের সত্যতা এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন জনাব রফিকুল ইসলাম হারেছ। উক্ত অধিবেশন সকাল সাড়ে ৯টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত চলে। ২য় ও সমাপনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মোহাম্মদ সাহাব উদ্দিন, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। তেলাওয়াতে কুরআন ও নযম বাংলা পাঠ করেন যথাক্রমে মৌলানা হেলাল উদ্দীন ও রফিকুল ইসলাম হারেছ। নও মোবাঈনদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। নসিহতমূলক বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা নওশাদ আহমদ, মোবশ্বের মুরব্বী। জলসায় আগত নও মোবাঈনদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন, সভাপতি, আমীর বি. বাড়ীয়া ও মুবাশ্বের মুরব্বী। উক্ত নও মোবাঈন জলসায় ৩০জন নও মোবাঈন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে সভাপতির দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মঞ্জুর হুসেন

সরিষাবাড়ী এলাকায় নও মোবাঈন জলসা-২০১১ অনুষ্ঠিত

গত ০৯/০৪/২০১১ তারিখ শনিবার দুপুর ১টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত হোসনাবাদ জামা'তে নও মোবাঈন জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন নও মোবাঈন জনাব আহসান আলী, ডা: মতিউর রহমান তার স্বরচিত নযম পাঠ করেন এবং সভাপতি জনাব কওসার আলী মোল্লা সেক্রেটারী তরবিয়ত, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শুরু হয়। অত:পর পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক পৃথকভাবে নও মোবাঈন পরিচিতি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

নও মোবাঈনদের মধ্য থেকে বক্তব্য প্রদান করেন সর্বজনাব ডা: আফজাল হোসেন, আনোয়ার হোসেন ও চাঁন মিঞা, বিষয় আমি কেন আহমদী হলাম ও আহমদীয়াত আমাকে কি দিয়েছে। মিসেস সাজিলা পারভীন ইসলামে নারীর মর্যাদা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন।

দিক নির্দেশনা ও তরবিয়তমূলক বক্তব্য রাখেন জনাব আব্দুল ওয়াদুদ, প্রেসিডেন্ট, সরিষাবাড়ী জামা'ত, জনাব মোজাম্মেল হক, প্রেসিডেন্ট, হোসনাবাদ জামাত, মওলানা আরিফুর রহীম ও মুহাম্মদ শামসুর রহমান। এতে ৫২ জন নও মোবাঈন ও ৩৫ জন জেরে তবলীগ মেহমানসহ মোট ১২১ জন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকল নও মোবাঈন তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদার ওয়াদা করেন এবং ১৪ জন নগদ পরিশোধ করেন। সবশেষে সভাপতির জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম শেষ হয়।

-শামসুর রহমান

ক্রোড়াতে তাহাজ্জুদের নামায অনুষ্ঠিত

গত ১৪-০৪-২০১১ তারিখ বাংলা ১লা বৈশাখ নববর্ষকে বাজামাত তাহাজ্জুদ নামাযের মাধ্যমে বরণ করি আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ক্রোড়ার সদস্যবৃন্দ। এতে আমরা মহান আল্লাহ্ তাআলার কাছে হুযূরের সর্বময় মঙ্গলসহ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়াতের মঙ্গল কামনা করে দোয়া করা হয়। সেই সাথে বিশ্ব মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা থেকে নিরসনের জন্যও দোয়া করা হয়। নামাযে উপস্থিত ছিল উৎসাহ জনক।

এনামুল হক

বগুড়ায় নও মোবাঈন জলসা অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রের নির্দেশক্রমে নিউসোনাতলা জামা'তের সকল নও মোবাঈনদেরকে নিয়ে গত ০৪/০১/২০১১ সকাল ১০টা হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত নও মোবাঈন জলসা বগুড়া মসজিদ কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব আব্দুস সালাম। কুরআন তেলাওয়াত করেন নও মোবাঈন জনাব হাফেজ আব্দুল আউয়াল । নযম পাঠ করেন জনাব হাসিবুল হক। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। বক্তৃতা করেন সর্বজনাব শেখ দিদার আহমদ রাজীব, ইউসুফ আলী, মোস্তাক আহমদ, জয়নাল আবেদীন এবং হাফিজুর রহমান ।

সমাপ্তি অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি জনাব কওসার আলী মোল্লা, এতে কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব রেজাউল করীম। বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব আবু সাঈদ, চেয়ারম্যান জলসা কমিটি, শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন, জনাব আজমল হক, প্রেসিডেন্ট আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বগুড়া এবং মৌ. আবু তাহের শেষে সভাপতির বিভিন্ন নসিহত ও ৩টি বয়আত গ্রহণের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়। উক্ত নও মোবাঈন সম্মেলনে ১১৬ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

মৌ. জাহিদুল ইসলাম

মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত ঘাটুরায় গত ২৩/০৩/২০১১ রোজ বুধবার বাদ মাগরিব স্থানীয় মসজিদে মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। উক্ত মসীহ্ মাওউদ দিবসের সভাপতিত্ব করেন সর্বজনাব মুজিবুর রহমান লস্কর। প্রেসিডেন্ট, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঘাটুরা, অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব এস, এম, এরফান। উর্দু নযম পাঠ করেন এস, এম, আরমান। প্রবন্ধ পাঠ করেন সজীব আহমদ, বক্তৃতা প্রদান করেন, মৌ, এনামুল হক রনি (মোয়াল্লেম)। এস, এম, হাবীব উল্লাহ্, সেক্রেটারী তালিম তরবিয়ত। নযম পাঠ করেন রাশেদ লস্কর। হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আবির্ভাব ও ইসলামের বিশ্ব বিজয় এই বিষয়ক বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব উজ্জ্বল আহমদ, আরো বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ মুসা মিয়া। সবশেষে সভাপতির ভাষণ, দোয়া ও মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে উক্ত দিবসের সমাপ্তি ঘটে।

এতে ১৩৪ জন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত ছিলেন।

এস,এম, হাবীবউল্লাহ্

খুলনায় ৫ম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন- ২০১১ অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার মুসীদের অংশগ্রহণে গত ১৪ এপ্রিল, ২০১১ তারিখ রোজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টা হতে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত ৫ম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন, ২০১১ দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ এর ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত জনাব মাহবুবুর রহমান। তেলাওয়াতে কুরআন ও দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অত:পর ওসীয়্যতকারীকে প্রকৃত মুত্তাকী হয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নির্দেশনা মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনার আহ্বান জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খুলনার আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক। খুলনা জামা'তের ওসীয়্যত সেক্রেটারী জনাব জিয়াদ আলী খুলনা জামা'তে ওসীয়্যতের কার্যক্রমের উপর রিপোর্ট পেশ করেন। অত:পর ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত ওসীয়্যতের গুরুত্ব এবং ওসীয়্যতকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করেন।

দ্বিতীয় পর্বে ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত ও খুলনা জামা'তের আমীর আল ওসীয়্যত পুস্তকের উপর আলোচনা করেন এবং উপস্থিত মুসীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। অত:পর দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়। এই সম্মেলনে খুলনা জামা'তের বর্তমান ৩৬জন ওসীয়্যতকারীর মধ্যে ২৬ জন ওসীয়্যতকারীসহ মোট ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

-মুহাম্মদ জিয়াদ আলী

লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের সীরাতুন্নবী (সা.) জলসা উদযাপিত

গত ০৬/ ০৪/২০১১ লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগরের উদ্যোগে সীরাতুন্নবী জলসা উদযাপন করা হয়। প্রথমে কুরআন তেলাওয়াত করেন মুসলেহা জাফর। দোয়া পরিচালনা করেন বিলকিস তাহের, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। হাদীস পাঠ করেন লাকী আহমদ। উক্ত জলসায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জন্ম ও শৈশবকাল নিয়ে আলোচনা করেন সেলিনা খোকা। এরপর নযম পেশ করেন নাফিয়া শারমিন। ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য প্রদান করেন মিলা পাটোয়ারী। হযরত রাসূল করীম (সা.)-এর উত্তম চরিত্র ও প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার এ সম্পর্কে বলেন নাফিয়া শারমিন। বদরের যুদ্ধ ও ও'হোদ'-এর যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করেন মুসলেহা জাফর, ইসলামের বাণী প্রচার ও রাসূলে করীম (সা.)-এর উপর অত্যাচার সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন রজনী দাউদ। হযরত নবী করীম (সা.)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সর্বশেষ আলোচনা করেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ আহমদনগর। পরিশেষে দোয়া ও আপ্যায়নের মাধ্যমে উক্ত সীরাতুন্নবী জলসার সমাপ্তি হয়। উক্ত দিবসে লাজনা ৫৪, নাসেরাত ১৫ এবং ৪ জন অ-আহমদী বোন উপস্থিত ছিলেন।

-মিলা পাটোয়ারী

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র মসীহ্ মাওউদ দিবস পালিত

নারায়ণগঞ্জ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে গত ০৮-০৪-২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মসীহ্ মাওউদ দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় মজলিসের প্রেসিডেন্ট দিলরুবা বেগম (মায়া)-এর সভানেত্রীত্বে ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে দিবসের কাজ শুরু হয়। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন শাহানা বাশার। উক্ত অনুষ্ঠানে উর্দু ও বাংলা নযম আবৃত্তি করেন খাওলাদ্বীন উপমা, হামিদা খায়ের এবং সানজিদা খন্দকার প্রীতি। অত:পর বক্তৃতা করেন পারভীন জামান, উম্মে কুলসুম চায়না, সেলিনা আক্তার এলিন, নসুরাত জাহান সুমি। সভানেত্রীর ভাষণ ও ইজতেমায়ী দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম শেষ হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ৩০ জন লাজনা ও ৩১ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

-উম্মে কুলসুম চায়না

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে ওসীয়্যতের উপর বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ১৮/ ০৩/২০১১ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে ওসীয়্যতের উপরে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভানেত্রী ছিলেন দীনা নাসরিন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ খুলনা। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। আল ওসীয়্যত পুস্তকের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন সভানেত্রী এবং সুলতানা ফাতিমা তারিক। এপর ওসীয়্যতের উপরে বিভিন্ন প্রশ্নের উপর উত্তর দেন। প্রশ্ন-উত্তরের পরে ৬ জন বোন ওসীয়্যত করার ওয়াদা করেন, আলহামদুলিল্লাহ্। উক্ত সভায় ২৪ জন লাজনা উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি শেষ করা হয়।

তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৫, ২৬ ও ২৭ মার্চ ২০১১ লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভানেত্রী ছিলেন দীনা নাসরিন, প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ খুলনা। কুরআন তেলাওয়াত ও নযম এবং দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভানেত্রী। উক্ত ক্লাসে সহীহ উচ্চারণে কুরআন ক্লাসসহ বিভিন্ন তালিম তরবীয়তমূলক বক্তৃতা প্রদান করা হয়। পরিশেষে সমাপনী ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে এই তালিম তরবিয়তী ক্লাসের সমাপ্তি হয়। - **রোকসানা মঞ্জুর**

নারায়ণগঞ্জে মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপিত

গত ২৫ মার্চ ২০১১ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় মসীহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করা হয়। স্থানীয় আমীর মোহতরম মঈন উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব আক্তার হোসেন। উর্দু নযম আবৃতি করেন সুলতান আহমদ এবং বাংলা নযম আবৃতি করেন সাইফুল আলম বিপুল। অত:পর বক্তৃতা পর্বে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দিবসের তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব নাজমুল আলম। সাদাকাতে মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন জনাব মনিরুজ্জামান খোকন, লেখনী সম্রাট হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এ বিষয়ে আলোচনা করেন মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের। রাসূল করীম (সা.)-এর প্রেমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ফজল মাহমুদ। ইসলামের সেবায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এ সম্বন্ধে বলেন ডা: মুজাফফর উদ্দিন আহমদ। সভাপতির ভাষণে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা ও আদর্শ অনুসরণ করে ইসলাম ও আহমদীয়াতের একনিষ্ঠ সেবক হওয়ার জন্য উপস্থিত সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথিসহ শতাধিক দর্শক শ্রোতা উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে সভার পরিসমাপ্তি ঘটে। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলের মাঝে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়।

-নাজমুল আলম রোমেল

কৃতী ছাত্রী

চট্টগ্রাম জামা'তের জনাব নেছার আহমেদ (সেক্রেটারী সানাতে তেজারত ও উমরে খারেজা) ও নুসরাত জাহান (সেক্রেটারী খেদমতে খাল্ক-লাজনা) এর বড় মেয়ে **'নুজহাত হাসিনা শমি'** অঙ্কুর সোসাইটি গার্লস্ হাই স্কুল থেকে এ বছরের এসএসসি পরীক্ষায় গোল্ডেন জিপিএ-৫ পেয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে, আল্হামদুলিল্লাহ। সে ইতোমধ্যে ভারত, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সৌদি আরব ভ্রমণ করেছে এবং মাতা-পিতার সাথে পবিত্র ওমরাহ্ হজ্ব পালন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। সে সকলের দোয়া প্রার্থী।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

এমটিএ, বাংলাদেশ স্টুডিও

তারিখ	জুন ২০১১ - MTA - এর বাংলা অনুষ্ঠানসূচী (বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টা)
URDV-467 ১ জুন, বুধবার	- "বর্তমান ও ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আহমদী তরুনদের কর্তব্য" - প্রফেসর ডঃ তারিক সাইফুল ইসলাম । এবং লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তর - মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন (পুণঃ)
URDV-468 ৪ জুন, শনিবার	- "বিয়ে-শাদী ও সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে সামজিক কদাচার পরিহারে আমাদের কর্তব্য" - কাওসার আলী মোল্লা - আলোচনাঃ "সীরাতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)" - মাওলানা জাফর আহমদ। (পুণঃপ্রচার)
URDV-469 ৬ জুন, শনিবার	- প্রশ্নোত্তর পর্বঃ লাজনাদের উদ্দেশ্যে- মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন, অনুবাদ-মাওলানা বশিরুর রহমান; - বক্তৃতাঃ "ইসলামে আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব ও কল্যাণ" - মাওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমিন । (পুণঃপ্রচার)
URDV - 470 ৭ জুন, মঙ্গলবার	- বক্তৃতাঃ "খাতামান্নাবীঈন (সাঃ) তত্ব ও হযরত ঈসা (আঃ) এর পুণরাগমন" - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী; - আলোচনাঃ "সীরাতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)" পর্ব-৩ - মাওলানা জাফর আহমদ । (পুণঃপ্রচার)
URDV- 471 ৮ জুন, বুধবার	- আলোচনাঃ "সীরাতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)" পর্ব-৪ - মাওলানা জাফর আহমদ; - বক্তৃতাঃ "ওয়াকফে নও দের পেশা নির্বাচন- কিছু দিক নির্দেশনা" - আহমদ তবশির চৌধুরী । (পুণঃপ্রচার)
URDV-433 ১১ জুন, শনিবার	- প্রজন্ম ভাবনা- ২ : আহমদী প্রজন্মের অংশগ্রহণে একটি অনুষ্ঠান, এবারের বিষয়- "উচ্চ শিক্ষা" বিজ্ঞ প্যানেল - আব্দুল আহাদ খান চৌধুরী:, কায়সারুল হক, ব্যরিষ্টার জাফর আহমদ; সঞ্চালক: অধ্যাপক নাজমুল হক। (পুণঃপ্রচার)
URDV-417 ১৩ জুন, সোমবার	- বক্তৃতাঃ "কুরআন করীম এর অপার সৌন্দর্য" - মাওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী; - আলোচনাঃ খলিফাতুল মসীহ সানী (রা:) এর জীবনী- মাওলানা আক্রামুল ইসলাম, সঞ্চালক: মামুন উর রশিদ । (পুণঃ)
URDV- 472 ১৪ জুন, মঙ্গলবার	- আলোচনাঃ "সীরাতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)" পর্ব-৫ - মাওলানা জাফর আহমদ; - বক্তৃতাঃ "বাংলাদেশে আহমদীয়াতঃ বর্তমান ও ভবিষ্যত" - জনাব মোবাশের উর রহমান । (নতুন)
URDV- 473 ১৫ জুন, বুধবার	- বক্তৃতাঃ "নৈতিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী শিক্ষা" - মাওলানা বশিরুর রহমান; - আলোচনাঃ "ইসলামে নারীর অধিকার" - লাজনা ইমাইল্লাহ পরিবেশিত । (নতুন)
URDV- 474 ১৮ জুন, শনিবার	- বক্তৃতাঃ "শেষ নবী প্রসঙ্গ" - আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী, বক্তৃতা- ৮১তম সালানা জলসা-২০০5 - লাজনা ইমাইল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তরঃ মাওলানা মুবাশ্বের আহমদ কাহলুন, অনুবাদ-মাওঃ বশিরুর রহমান । (নতুন)
URDV- 475 ২০ জুন, সোমবার	- আন্তঃধর্মীয় শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য সম্মেলন; - নযম (নতুন)
URDV- 476 ২১ জুন, মঙ্গলবার	- দরসে মলফুযাতঃ মাওলানা সালেহ আহমদ - "আমি কেন আহমদী হলাম ?" - অংশগ্রহনেঃ হাফেয মাওঃ এস.এম. আবু তাহের ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান । (নতুন)
URDV- 477 ২২ জুন, বুধবার	- "প্রজন্ম ভাবনা" পর্ব - ৫ - বিষয়ঃ "ইন্টারনেট ও নতুন প্রজন্ম" - প্যানেল আলোচক- ডি. এইচ. আজাদ, হেড অফ ফিন্যান্সিয়াল সর্ভিস, গ্রামীন ফোন; নাভেদ ইকবাল, চীফ টেকনোলোজী অফিসার ব্র্যাক ব্যাঙ্ক; আহমদ তবশির চৌধুরী, তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ ও এম টি এ বাংলাদেশ শাখা প্রধান; সঞ্চালক- অধ্যাপক নাজমুল হক; অংশগ্রহনে - বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আহমদী ছাত্রগন। (নতুন)
২৩ জুন- ২৯ জুন	"সত্যের সন্ধানে" ১০ম পর্ব পুণঃপ্রচার
৩০ জুন - ৩ জুলাই,	"সত্যের সন্ধানে" ১১শ পর্ব, ৪ দিন । (নতুন)

<u>বিঃদ্রঃ</u> **প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যা ৬ টাঃ** হযরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস (আইঃ) জুমুয়ার খুতবা সরাসরি সম্প্রচার ও তার পর কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান।

প্রতি বৃহঃস্পতিবার সন্ধ্যা ৭ টাঃ হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার পুণঃপ্রচার

প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৭ টাঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের অনুষ্ঠান।

হুযুরের (আইঃ) জুমুয়ার খুতবার সরাসরি বাংলা সম্প্রচার সহ MTA দেখুন ইন্টারনেটেঃ

http://www.mta.tv

অনুষ্ঠান বিষয়ে আপনার মূল্যবান পরামর্শ পাঠানঃ আহমদ তবশির চৌধুরী, ইনচার্জ, এম টি এ, বাংলাদেশ স্টুডিও।
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ, ৪ বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১। Email: atabshir@hotmail.com

ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জামা'তে অনুষ্ঠিত আঞ্চলিক নও মোবাঈন জলসার দু'টি আলোকচিত্র

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org;www.mta.tv

Amecon
Since 1985
www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

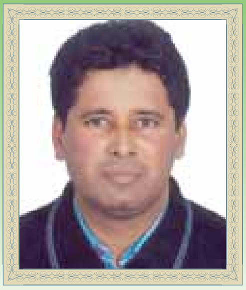

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com